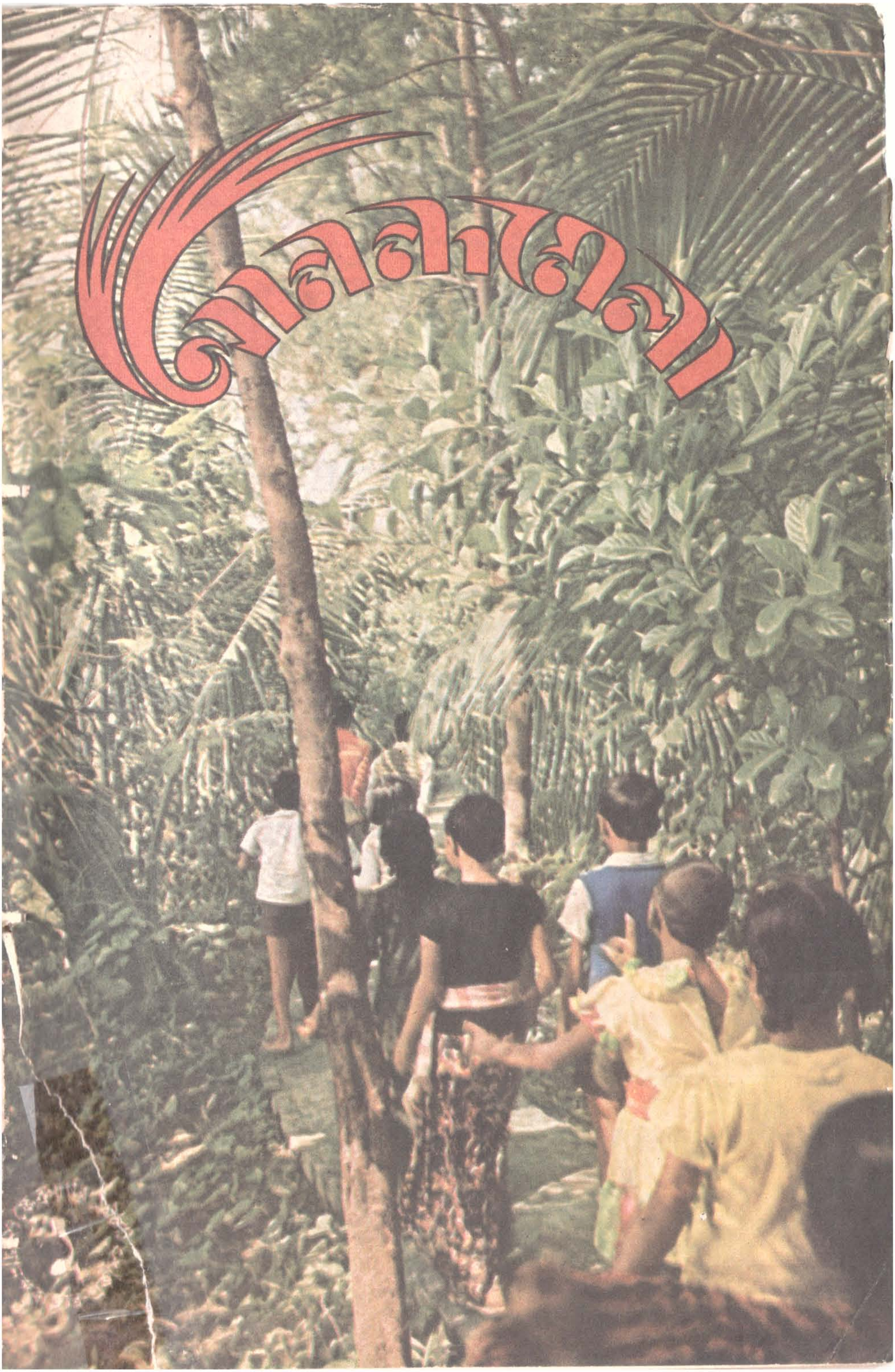




পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি দিয়েছেন - শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, সোমনাথ দাসগুপ্ত

স্ক্যান করেছেন - সঙ্ঘামিত্রা সরকার

এডিট করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার স্পেশাল ইস্যু থাকে
এবং আপনি যদি আমাদের সাথে সেগুলি সংরক্ষণে সাহায্য করতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

মনে আছে কি, ছোটবেলায় যখন দাঁতের যন্ত্রনা হ'ত,
তখন ঠাকুমা লবঙ্গের তেল লাগিয়ে কেমন তা সারিয়ে তুলতেন?
আপনার দাঁতের ডাক্তার আজও তা ব্যবহার করেন!

নতুন প্রমিস

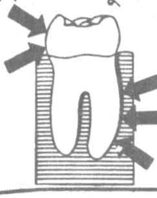
এক অদ্বিতীয় টুথপেষ্ট
যাতে আছে চিরকালের ব্যবহৃত লবঙ্গের তেল!



বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
আধুনিক সহায়ক

সত্যি!
প্রমিসের মত
এমন টুথপেষ্ট তৈরী করার
কথা আগে কেউ
ভাবেনি কেন?

লবঙ্গের তেল মিশ্রিত নতুন প্রমিস টুথপেষ্ট



১.
দাঁতের ক্ষয়
নিবারণ করতে
সাহায্য করে।

২.
মুখের ভেতর
তাজা রাখার দরুন
নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ
হতে দেয় না।



সুস্থ সবল দাঁত ও মাড়ি
আর তাজা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে...প্রমিস!

বিশেষ প্রমিস উপহারের জন্য আপনার ডীলারের কাছে খোঁজ নিন

আনন্দমেলা

১৪ ফাল্গুন ১৩৮৬•২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০•৫ বর্ষ•২০ সংখ্যা

চ্ছদ বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

সম্পাদক **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাংপাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

শিশুদের নন্দনকানন

রঞ্জন ভাদুড়ী

চলো, আজ তোমাকে নিয়ে যাব এক স্বপ্নরাজ্যে, যেখানে তোমার মতো শিশুরাই তাদের রাজ্যপাট চালাচ্ছে, যেখানকার উদার আকাশ মুক্ত বাতাস তোমাকে স্বাগত জানাবার জন্য উৎসুক উন্মুখ হয়ে আছে। সেখানে আকাশের তারার মতোই অগুনতি রঙবাহারি ফুল ফুটে রয়েছে, আর সেইসব ফুলের পাশে পাশে খেলে বেড়াচ্ছে রঙিন প্রজাপতির মতো শিশুরা। হ্যাঁ, বিধান শিশু উদ্যানের কথাই বলছি।

কলকাতার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউয়ের ওপারে যেখান থেকে লবণহ্রদের শুরু সেখানে প্রায় সাড়ে-চৌষট্টি বিঘে জমির উপর তৈরি হয়েছে শিশুদের এই আশ্চর্য নন্দনকানন। নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ থেকে, যার চলতি নাম ভি আই পি রোড, বিধানচন্দ্রের এক শুভ্র সম্ভ্রান্ত পূর্ণাবয়ব মূর্তিকে দু-হাতে শঙ্খের মতো ধারণ করে পূবদিকে একটা ছিমছাম ছোট্ট দুমুখো রাস্তা চলে গেছে। শেষ হয়েছে উদ্যানে। নাম বিধান শিশু সরণি। ওই তো দেখা যাচ্ছে উদ্যানের ফটক, পাঁচিল-বরাবর ইউক্যালিপটাস গাছের আড়ালে উঁকি দিচ্ছে বিধান-ভবন। পথে নানাবয়সি ছেলেমেয়ে।

আমরা এসে পড়েছি উদ্যানের দোরগোড়ায়। চলো, ভিতরে যাই। আজ সবাইকার জন্যে উদ্যানের দুয়ার খোলা। সপ্তাহের অন্যদিন কিন্তু এমন নয়, সঙ্গে একজন বা একের বেশি শিশুর ভিসা না-থাকলে কোনো বড়র সেদিন প্রবেশাধিকার নেই। তার মানে তুমি একা যে-কোনোদিন ঢুকতে পারো, রবিবার বাদে আমার সে-উপায় নেই।

চলো, আগে উদ্যানটা ঘুরে দেখি।

ডানদিকে বিরাট সবুজ মাঠ। উদ্যানের বেশির ভাগ খেলাধুলোর আসর বসে এই মাঠেই। ওই তো ছেলেরা বাস্কেট বল, ভলিবল খেলছে। একদিকে ব্রতচারী শেখানো হচ্ছে. আর-এক দিকে জিমন্যাস্টিকস। একেবারে খুদেরা পি-টির তালিম নিচ্ছে। খেলাধুলোর তালিকায় আরও কত মজাদার জিনিস রয়েছে—খো-খো কবাডি হ্যান্ডবল যোগব্যায়াম। আর আছে তীরন্দাজি। ওই তো তীরধনুক-হাতে হবু-যোদ্ধারা চাঁদমারিতে



বিধান-সরোবরে পাড়ি জমাচ্ছে নৌকো। ঘাটে শিশুদের জটলা



টিলার উপর ওভারব্রিজ। দড়ির মই বেয়ে সেখানে ওঠার সময় নিজেকে টারজান মনে হয়



সুড়ঙ্গের মুখে খুদে খবরদারি

তাঁর বেঁধেছে। এই মাঠের উত্তর-পশ্চিম দুই ধার-বরাবর ফেব্রুয়ারির গোড়ায় সারি-সারি তেরপলের ছাউনি পড়ে। বসে মুক্তাঙ্গন মেলা আর প্রতিযোগিতার আসর। চোদ্দ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েরা এই মুক্তাঙ্গন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। কোনো প্রবেশমূল্য নেই। দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য আসর উদ্যানকে জাঁকিয়ে রাখে। শিবিরে শিবিরে চলে শিশুশিল্পীদের গানবাজনা আবৃত্তি, ছবি-আঁকা, হাতের কাজ, প্রবন্ধ লেখা। সে এক দেখার মতো দৃশ্য। যেন শীতের চিড়িয়াখানার পক্ষিনিবাসে অসংখ্য পাখির একত্র সমাবেশ আর বিচিত্র কলধ্বনি। ফলাফল-ঘোষণা আর পুরস্কার-বিতরণ সেই-দিনই সন্ধেবেলা। যে যার পুরস্কার নিয়ে হাসিমুখে বাড়ি ফেরে। এছাড়া প্রতিবছর শুধুমাত্র উদ্যানের সভ্য-সভ্যাদের জন্যে একটি বৃত্তি প্রতিযোগিতা চালু আছে। খেলাধুলো আর কলাবিদ্যার প্রতিটি বিষয়ে সেরা প্রতিযোগীকে মাসে পঁচিশ টাকা করে এক বছর মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়। এক-একটা বৃত্তি এক-একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নামে।

উদ্যানের প্রধান সড়ক ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। দু-পাশে ফুলের কেয়ারি আর বাহারি গাছের টবের সারি। মাঝে মাঝে গোলাপ বেড। সারিবন্ধ দেবদারুর ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে ডালিয়া, ম্যাগনোলিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, বোগেনভেলিয়া, রঙ্গন। এখানে-ওখানে বাঘমুখো প্যানজি ফুল চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে। ডান দিকে একটু দূরে দূরে দুটো পাথুরে হাতি শুঁড় উঁচিয়ে বহুমুখী জলধারা শূন্যে নিক্ষেপ করছে। বাঁ দিকে বিধানচন্দ্রের আবক্ষ মূর্তির দু' পাশে বিশাল ধূপদানির আদলে আরও দুটি ফোয়ারা। কয়েক পা এগোলে দেখতে পাবে বিধান-ভবনের পিছন দিকে লাগোয়া মুক্তমঞ্চ। মঞ্চের সামনে খানিকটা ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠে কারা যেন সারি-সারি স্ট্যাচুর মতো উবু হয়ে বসে আছে। আসলে ওখানে যোগব্যায়াম চলছে। মুক্তমঞ্চে যখন উৎসব-অনুষ্ঠান চলে তখন ওই মাঠেই শতরঞ্চি আর চেয়ার পড়ে—ছোটদের বড়দের বসার ব্যবস্থা। বিধান শিশু উদ্যানের উৎসব-অনুষ্ঠান? সে তো বারো মাসে তেরো পার্বণকেও ছাড়িয়ে যায়! উদ্যানে সবচেয়ে বড় উৎসব জুলাই মাসে। পয়লা জুলাই বিধানচন্দ্রের জন্মদিনে এই উৎসবের সূচনা। বেশ কয়েকদিন ধরে চলে নাট্যোৎসব, শিশুমেলা, জাদুপ্রদর্শনী। বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে দেখানো হয় খুদে বিজ্ঞানীদের নানান বিস্ময়কর কীর্তি। এছাড়া পনেরোই আগস্ট, ছাব্বিশে জানুয়ারি, পয়লা বৈশাখ, শ্রীপঞ্চমী এবং মনীষীদের জন্মদিন পালন করা হয় বেশ ঘটা করে। উদ্যানের সভ্য-সভ্যাদের ঘরোয়া অনুষ্ঠান তো লেগেই আছে। বেশিরভাগ অনুষ্ঠানই পরিচালনা করে তোমার মতো শিশুরা। তাদের কেউ হয় সভাপতি, কেউ হয় ঘোষক, কেউ দেয় বক্তৃতা।

সামনে দ্যাখো, অনেক ছেলেমেয়ে, এমন-কী বড়রাও, গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছে। ওটা হচ্ছে উদ্যানের মাছের চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চা না-বলে পাড়-উঁচু গোলাকার পুকুর

বললেই ভাল হয়। বড় বড় সব রঙিন মাছ ঢাউস চৌবাচ্চার জলে খেলে বেড়াচ্ছে। চৌবাচ্চাটিকে ঘিরে রেখেছে একটা শান-বাঁধানো গোলাকার পার্ক। সেখানে নানা রঙের বেঞ্চি যেন গোলটেবিল বৈঠক বসিয়েছে। বাঁ দিকে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর আবক্ষমূর্তির চারপাশে নানা রঙের মরসুমি ফুলের মেলা। একটু দূরে দশটি রবার গাছ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে।

এরপরে মাধবীলতার গেট পেরিয়ে পার্ক-ল্যাণ্ড। সেখানেও অজস্র ফুলের মেলা। মাঝে মাঝে গাছপালা। এই পার্কল্যাণ্ডই কিন্তু উদ্যানের মধ্যভাণ্ড। এখানে ইতিউতি ছড়িয়ে আছে অফুরন্ত মজা। আনন্দ আহরণের অজস্র সরঞ্জাম। আছে দোলনা চরকি. নাগর-দোলা, স্লাইড, স্লিপ, সী-স, রোপওয়ে. নকল পাহাড়, পাহাড়ের গুহা, সুড়ঙ্গপথ, গাছে বা পাহাড়ের উপর ওভারব্রিজে ওঠার দড়ির মই —দেখে মনে হয় কোনটা ছেড়ে কোনটায় যাই। তুমিও তো আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়েছ। চরকিতে খানিক ঘুরপাক খেয়ে এলে এইমাত্তর, তারপর দোলনায় চাপলে এখন আবার স্লাইডের দিকে লোভীর মতো তাকিয়ে আছ। কী বলছ? আমিও দোলনায় চাপব? উঁহু, সেটি হচ্ছে না। চোদ্দ পেরিয়ে গেলে ওইসব খেলার সরঞ্জাম ব্যবহার করা যায় না। আর ওই-যে দেখছ কচি-কচি দোলনা চরকি আর স্লিপ, ওগুলোয় চড়তে গেলে আরও ছ'বছর বয়েস কমাতে হবে। দ্যাখো বাহাদুররা কেমন দড়ির মই বেয়ে তরতর করে গাছে উঠছে। আর একদল গুঁড়ি মেরে সুড়ঙ্গ পার হচ্ছে। কেউ কেউ ঢেঁকিতে চেপে পালা করে আকাশ-পাতাল করছে। খেলার রাজ্যে কী দারুণ মাতামাতি। বড়রা রঙিন বেঞ্চিতে বসে দেখছেন ছোটদের কাণ্ড-কারখানা। এক পাশে এক সাদাচুল হাসিমুখ বৃদ্ধ বসে আছেন একটা বেঞ্চির মাঝখানে। তাঁর দু'পাশে কয়েকটি ছেলেমেয়ে। শিশুদের উনি ভারী ভালবাসেন। তাদের নিয়েই ওঁর দিনের বেশির ভাগ সময় কাটে। ঠিকই ধরেছ, উনিই শ্রীঅতুল্য ঘোষ—উদ্যানের শিশুদের অতি আদরের 'দাদু'। একটি ছেলে সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওঁর দিকে যেতেই উনি হাত বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে ধরে নিজের পাশে বসালেন। ছেলেটির একখানা পায়ে



লাইব্রেরি থেকে বই পেতে যা দেরি

খুঁত ছিল, লাঠিভর দিয়ে উদ্যানে আসত। একদিন 'দাদু'র নজরে পড়ে গেল। উনি ওকে ভরতি করে নিলেন। দু-দুটো শিবির করার পর ছেলেটি পায়ে অনেক বল পেয়েছে। এখন অল্পস্বল্প ছুটতেও পারে। শিবির কী জানতে চাইছ? এই উদ্যানে বছরে দুবার আবাসিক শিবির বসে—শীতে আর গ্রীষ্মে। সাতদিন ধরে চলে। দুটি শিবির মিলিয়ে যোগ দেয় দুশোরও বেশি ছেলেমেয়ে। মা-বাবা প্রিয়জনদের ছেড়ে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে তারা হাজির হয় উদ্যানে। শিবিরে তারা স্বনির্ভর ও সুশৃঙ্খল হবার তালিম পায়। একমাত্র রান্না ছাড়া সবই করতে হয় নিজের হাতে। সকালে শয্যাত্যাগ থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত রুটিন-বাঁধা জীবন। সে-জীবনের আনন্দই আলাদা। শিবির শেষ করে এক চোখে হাসি আর এক চোখে জল নিয়ে তারা বাড়ি ফেরে। কদিনে উদ্যান যে তাদের বড় আপন হয়ে যায়!

ছবির চেয়েও সুন্দর পার্কল্যাণ্ড বিশাল এক ঘেরা পুকুরের ধারে থমকে গেছে। কে বলবে এই কাকচক্ষু পুকুরটা একসময় হাজা-মজা ছিল! চলো, ডান দিকে বাঁক নেওয়া যাক। সাড়ে-চৌষট্টি বিঘের বিরাট উদ্যান কি এত



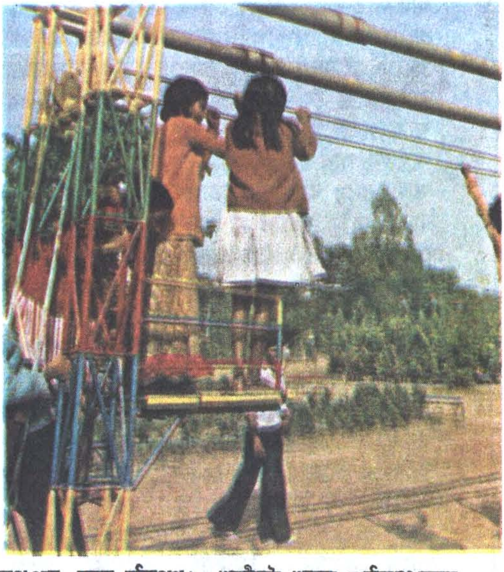
স্লাইডে উঠতে যা কষ্ট, নামা কিন্তু সহজ

শিগগির শেষ হয়! পুকুরকে পাশ কাটিয়ে ওপারে যেতে পথের দুধারে আরও কত মজা। সামনে দুটো খোলামেলা বিচিত্র গড়নের চালাঘর। মেঝেয় গুটি-কয় রঙিন বেঞ্চি। দু-দণ্ড বসতে পারো, সঙ্গে খাবার-দাবার থাকলে ওখানে বসে খেতেও পারো।

এবার বাঁ দিকে যেতে হবে। পুকুরের দক্ষিণ পাড় দিয়ে চলে গেছে একটা সরু পাকা রাস্তা। যেন কুঞ্জবনের পাখিডাকা ছায়াঢাকা বনপথ। বাঁয়ে পুকুরের ধার ঘেঁষে সারি সারি দোলনা, চরকি, স্লিপ। দেশী-বিদেশী বিচিত্র মরসুমি ফুলের মেলা। নাগালের মধ্যে এত ফুল পেয়ে দু-একটা তুলতে যেয়ো না যেন! তোমার অলক্ষ্যে সতর্ক চোখগুলো নজর রাখছে—ঠিক ধরে ফেলবে। একবার এক ভদ্রমহিলা লোভে পড়ে একটা ফুল ছিঁড়ে নিজের নাতির হাতে নাকাল হয়েছিলেন। বিচ্ছু ছেলেটি তাঁর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল 'দাদু'র কাছে। ডান দিকে উদ্যানের দেওয়াল ঘেঁষে ছোট বড় মাঝারি অসংখ্য গাছের গার্ড অব অনার। কত রকমের ফুল আর গাছ যে আছে এই সাড়ে-তিন বছরের 'শিশু' উদ্যানে, না-দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। সারা উদ্যানে ছড়িয়ে রয়েছে হাজারো উদ্ভিদ। কয়েকটি নাম তো আগেই বলেছি। আরও কয়েকটি জেনে নাও —আছে সিলভার ওক, কৃষ্ণচূড়া, লোহা, কদম, কাঁটাওলা আর মসৃণ শিমুল, পলাশ, চেরি, শাল, সেগুন তাল তমাল বকুল শিশু অর্জুন চন্দন মহানিম আম জাম জারুল জামরুল; আছে পানসিটিয়া, আরকেরিয়া কুকি—যাকে বলে খ্রীষ্টমাস ট্রী, থ্যাসপেসিয়া, অ্যালামেণ্ডা, মুসায়েণ্ডা টিকোমা ফুরুস বটলব্রাশ লিলি লাইল্যাক কামিনী গাঁদা গোলাপ মারুণ্ডা ক্যালেরাণ্ডন —সব বলতে গেলে শোনার ধৈর্য থাকবে না তোমার। এইসব গাছ পাতা ফুলের রঙের কাছে রামধনুর রঙের ছটাও হার মানে। এছাড়াও আছে উদ্যানের শস্যখেত—গম ফলে সেখানে। কিচেন গার্ডেনে হয় আলু, কপি, টম্যাটো, পেঁয়াজ, লঙ্কা ইত্যাদি আনাজের চাষ।

মাঝে মাঝেই খেলনার মতো ছোট ছোট জলের কল দেখছ। গলা শুকিয়ে গেছে? ওই কলটা থেকে খেয়ে নাও। কে যেন খুলে বন্ধ করেনি। তার কাজটাও করে দাও বরং।

উদ্যানের এদিকটা একটু নিরিবিলি। পার্কল্যাণ্ড আর খেলার মাঠের হৈচৈ এখানে



রোপওয়ে, মানে দড়িপথ। শরীরটা শূন্যে ঝুলিয়ে হাতে

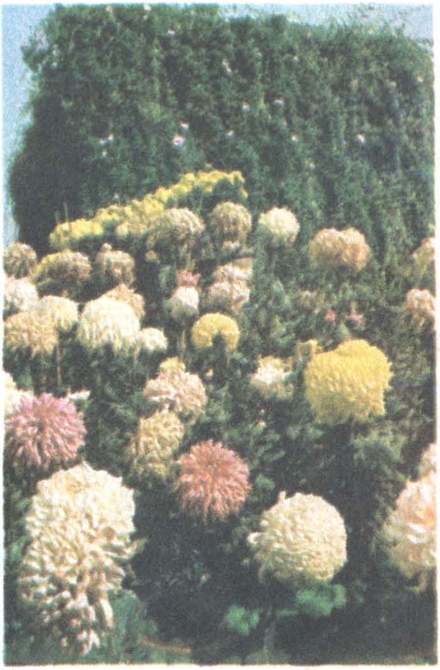
ততটা নেই। এদিকে আছে পিকনিক কর্নার, ছবিআঁকা আর হাতের কাজ শেখার দুটো মণ্ডপ, শস্যখেত আর যথারীতি গাছপালার কলকা-বসানো, ফুলের বুটিদার বিরাট সবুজ মাঠ। পুকুরের উত্তর পাড় ঘেঁষে পাঁচিলের ধারে সারিবন্ধ ঝাউবন, মাঝে মাঝে আকাশ-মণির উঁকিঝুঁকি। ওপাশে অর্থাৎ পশ্চিম পারে দেখা যাচ্ছে পুকুরের বাঁধানো ঘাট, তার পাশেই অগভীর জলে পর পর সাঁতার-এলাকা চিহ্নিত করা আছে। বলা হয়নি—এই উদ্যানে সাঁতারও শেখানো হয়।

বিশাল বিধান সরোবরের ওপারে গাছ-গাছালির ফাঁকে অন্য রকম সূর্যাস্ত হচ্ছে। এবার ফেরা যাক। ফিরতি-পথে বিধান-ভবনটা ঘুরে যাওয়ার কথা।

বিধান-ভবনের সুদীর্ঘ সিঁড়ির ধাপে ধাপে বাহারি গাছ আর ফুলের টব। প্রশস্ত লবিতে শিশুশিল্পীদের আঁকা রঙিন ছবি, অ্যাকোয়ারিয়াম, কাচের বাক্সে নানান মডেল। বাঁ দিকে লাইব্রেরি, দোতলার রীডিং রুমের সিঁড়ি। ডানদিকে অফিস-ঘর, হবি সেণ্টার। মাঝখানে অডিটোরিয়ামের প্রবেশদ্বার। অডি-টোরিয়ামে লেকচার ক্লাস আর বর্ষাবাদলার দিনে উদ্যানের ঘরোয়া অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ৪২৫ জন বসতে পারে। দোতলার রীডিং-রুমে একশোজনের আসন। লাইব্রেরিটা বেশ



–হাটার কসরত



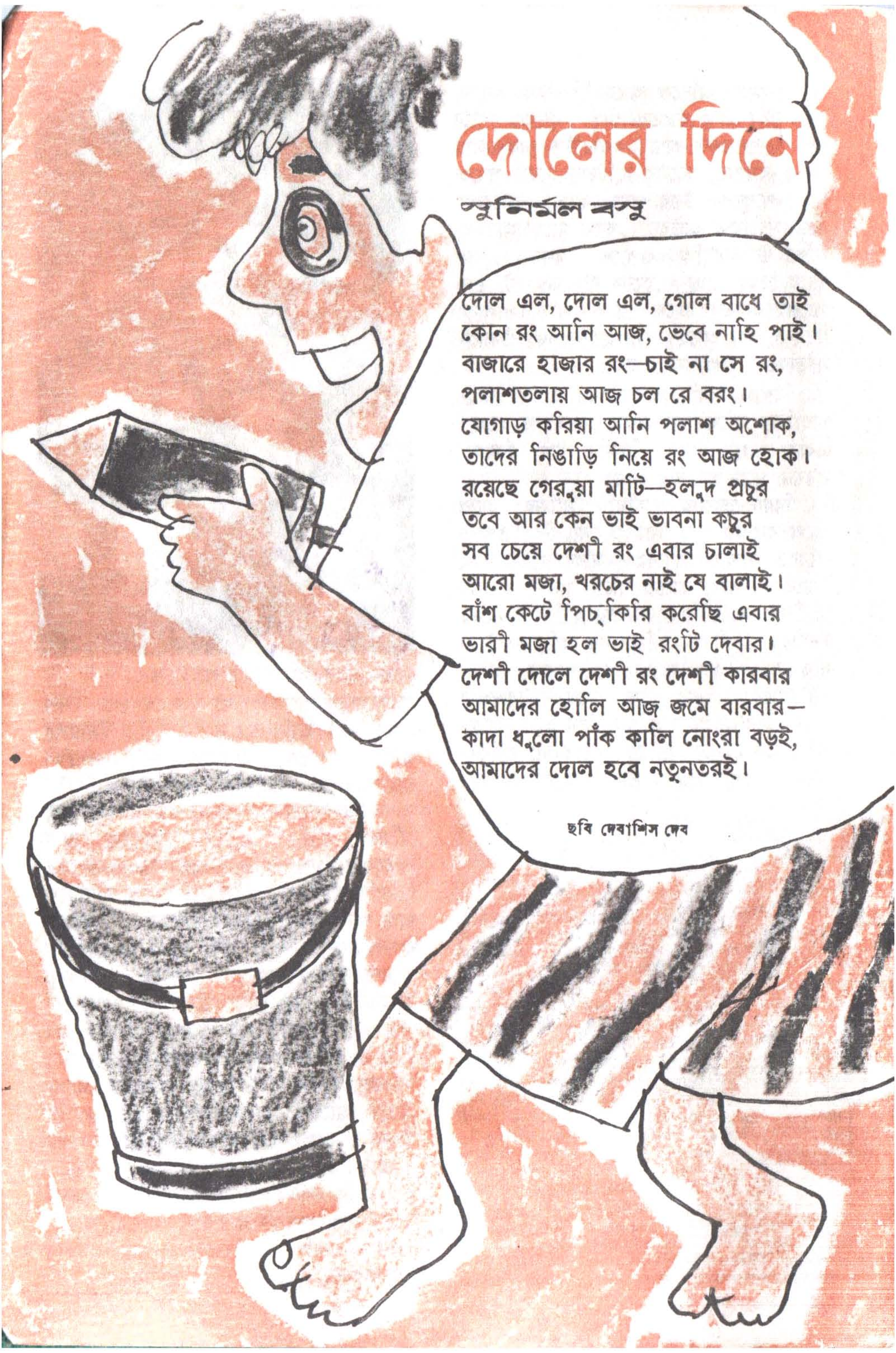
উদ্যানে ফুলের মেলা আর লুকোচুরি-খেলা

সাজানো-গোছানো। বই আছে প্রায় দশ হাজার। লাইব্রেরি-কক্ষের একদিকে উদ্যানের মাসিক পত্রিকা ‘খেয়ালখুশি’র দপ্তর। বৃহস্পতিবার লাইব্রেরি বন্ধ থাকে।

হবিসেন্টারে শেখানো হয় নাচ, গান, অভিনয়—শনি-রবি দুদিন। আবৃত্তি আর বিতর্কের ক্লাস হয় রবিবারে। বিধান-ভবনের উত্তরদিকে কিচেন গার্ডেনে যেতে ডানদিকে দুই পান্থপাদপের প্রহরী তোমাকে বিতর্ক-মণ্ডপ দেখিয়ে দেবে। এই যে এত খেলাধুলো পড়াশুনো, শিল্পচর্চা — সবই কিন্তু অবৈতনিক। ছয় থেকে চোদ্দ পর্যন্ত যে-কোনো ছেলেমেয়েই এই সুযোগ পেতে পারে। উদ্যানের সভ্য-সংখ্যা এখন প্রায় তিন হাজার। বিভিন্ন বিভাগে বেশ কিছু অবাঙালি ছেলে-মেয়েও আছে। চোদ্দ পেরিয়েও অনেকে উদ্যানের সংগে যুক্ত রয়েছে সিনিয়র মেম্বার হিসেবে। এই সুযোগ ষোলো বছর পর্যন্ত।

ঢং ঢং ঘন্টা বাজল। আজকের মতো ছুটি। কলাকেন্দ্র থেকে ভেসে আসছে কোরাস কণ্ঠে সমাপ্তি-সংগীতের সুর—‘মহান নেতার নামে গড়া মোদের এ উদ্যান—’

ফোটো বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত



দোলের দিনে

স্থনির্মল বস্থ

দোল এল, দোল এল, গোল বাধে তাই
কোন রং আনি আজ, ভেবে নাহি পাই।
বাজারে হাজার রং—চাই না সে রং,
পলাশতলায় আজ চল রে বরং।
যোগাড় করিয়া আনি পলাশ অশোক,
তাদের নিঙাড়ি নিয়ে রং আজ হোক।
রয়েছে গেরুয়া মাটি—হলুদ প্রচুর
তবে আর কেন ভাই ভাবনা কচুর
সব চেয়ে দেশী রং এবার চালাই
আরো মজা, খরচের নাই যে বালাই।
বাঁশ কেটে পিচ্‌কিরি করেছি এবার
ভারী মজা হল ভাই রংটি দেবার।
দেশী দোলে দেশী রং দেশী কারবার
আমাদের হোলি আজ জমে বারবার—
কাদা ধুলো পাঁক কালি নোংরা বড়ই,
আমাদের দোল হবে নতুনতরই।

ছবি দেবাশিস দেব



সোমেন গুপ্ত উড়ে গেলেন

রমানাথ রায়

হঠাৎ খবর পেলাম সোমেন গুপ্ত আবার বাড়ি ফিরে এসেছেন। তিনি এতদিন কোথায় ছিলেন তা জানার ভারী কৌতূহল হল। একদিন বিকেলে তাঁর বাড়ি গেলাম। একটা পোড়ো জমির পাশে দোতলা বাড়ি। সোমেন গুপ্ত এই বাড়িতে শুধু একটা চাকর নিয়ে থাকেন। বাড়ি ঢুকে চাকরটার দেখা পেলাম না। ছুটি নিয়ে দেশে গেছে হয়তো।

সোমেন গুপ্ত দোতলায় থাকেন। আমি দোতলায় উঠে এলাম। তাঁর ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলছে। আমি কলিং বেল টিপলাম। ভিতরে ডিডং শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে সোমেন গুপ্ত বেরিয়ে এলেন। তারপর আমাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, ''আরে! এসো, এসো, ভিতরে এসো।''

আমি ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। ঘর-ভর্তি বই। এছাড়া আছে টেবিল, চেয়ার, সোফা-সেট। এই ঘরে সোমেন গুপ্ত পড়াশুনো করেন, গল্প-গুজব করেন। আমরা সোফায় মুখোমুখি বসলাম।

সোমেন গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, "বলো, কী খবর?''

"আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।" বলে ভাবলাম এবার জিজ্ঞেস করি, "আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন?"

কিন্তু এই প্রশ্ন করার আগেই সোমেন গুপ্ত বললেন, "ঠিক সময়ে এসেছ। আর একটু পরে এলে দেখা হত না।''

"কেন?"

"এখুনি পাপন যেতে হবে। আর দেরি নেই।"

আমি কথাটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, "পাপন কী?"

"একটা গ্রহ।"

"সেটা কোথায়?"

"আমাদের এই সৌরজগতের কাছেই আর একটা সৌরজগৎ আছে। সেই সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ পাপন। ওখানকার ভাষায় পাপন কথার অর্থ হল সুন্দর। এই গ্রহের আয়তন পৃথিবীর তুলনায় অর্ধেক বললেই চলে।"

"তা, সেখানে কী করতে যাবেন?"

এর উত্তরে সোমেন গুপ্ত একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, ''পাপন গ্রহের অধিবাসীরা ভীষণ বিপদে পড়েছে।"

আমি বুঝতে পারলাম সোমেন গুপ্তর মাথা এখনও ভাল হয়নি। আগের মতোই আছে। তবুও কৌতূহলী হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, "কী বিপদ?"

তারপর সোমেন গুপ্ত ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "পাপন গ্রহের কাছেই আর একটা গ্রহ আছে। তার নাম নিপুয়া। নিপুয়া কথার অর্থ হল রাক্ষস। নিপুয়ার আয়তন অনেকটা পাপনের মতোই। কিন্তু এর লোকসংখ্যা পাপনের দশগুণ। এখানে লোকসংখ্যা প্রতি বছর যে হারে বাড়ছে তাতে দেখা গেছে যে, আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে মানুষের শোবার জায়গা দূরের কথা দাঁড়ানোর জায়গাও আর থাকবে না। তাই তারা পাপন গ্রহ দখল করতে চাইছে। ফলে পাপন গ্রহের অধিবাসীরা ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। অথচ পাপন বিজ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত। এতই উন্নত যে ওখানে মোটর গাড়ি আমাদের দেশে গরুর গাড়ির মতোই একেবারে সেকেলে এবং অচল হয়ে গেছে। মোটর গাড়ি এখন ওদের জাদুঘরে স্থান পেয়েছে। ভাবছ, ওরা তাহলে যাতায়াত করে কিসে? ওরা এক জায়গা থেকে আর জায়গায় পাখির মতো উড়ে যাতায়াত করে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওরা অত্যন্ত সৎ এবং শান্তি-প্রিয়। ওরা তাই চিরকালই যুদ্ধবিমুখ। ওরা বিজ্ঞানকে আদিকাল থেকে মানুষের কল্যাণেই ব্যবহার করে এসেছে। কোনোদিন যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ বা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার কথা ভাবেইনি। এখন নিপুয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়া উপায় নেই দেখে রীতিমত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। নিপুয়ার হাত থেকে কীভাবে বাঁচবে বুঝতে পারছে না। সেই কারণে কিছুদিন আগে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। আমি..."

সোমেন গুপ্তর কথা সম্পূর্ণ হবার আগেই জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি তাহলে এতদিন পাপন গ্রহে ছিলেন?''

"হ্যাঁ।"

এবার একটু কৌতুক করেই জিজ্ঞেস করলাম, "তা, সেখানে গিয়ে কী বললেন?"

"পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বড়-বড় বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে একটা মহাসম্মেলন করতে বললাম।"

"কারণ?"

''কারণ পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের মতো আর কোনও গ্রহের বৈজ্ঞানিকরা মারণাস্ত্র উদ্ভাবনে এতখানি পটু নয়।"

এবার একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, "আজ কি সেই মহাসম্মেলনে যোগদান করতে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

আমি আবার একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, "তা, এখন কিসে যাবেন?"

"চেয়ারে।"

কথাটা শুনে প্রায় হেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাসি দমন করে বিস্ময় প্রকাশ করলাম, "চেয়ারে!"

"হ্যাঁ, চেয়ারে।" বলে একটু হেসে সোমেন গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছ, আমার মাথা খারাপ। আমি ভুল বকছি।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হওয়ার ভান করে প্রতিবাদের স্বরে বললাম, ''না, না, অবিশ্বাস..."

কথা আমার শেষ হল না। সোমেন গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, "শুনতে পাচ্ছ?"

সত্যি, তখন আমি একটা গোঁ-গোঁ শব্দ শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ''কিসের শব্দ ওটা?"

"ঐ চেয়ারের। জানলার দিকে তাকাও। তাকালেই দেখতে পাবে।''

আমি সোমেন গুপ্তর কথামতো জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। তাকাতেই চমকে উঠলাম। দেখলাম মোচার মতো একটা যন্ত্র তীব্র গতিতে সামনের পোড়ো জমির ওপর নেমে আসছে। আমি কৌতূহলী হয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। যন্ত্রটা ক্রমশ নীচে নামতে লাগল। নামতে নামতে তার চেহারা বদলে গেল। একটা চেয়ারের মতো হয়ে মাটি স্পর্শ করে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

সোমেন গুপ্ত বসে বসেই জিজ্ঞেস করলেন, "নামল বোধহয়?"

আমি জানলা থেকে সরে এসে বললাম, "হ্যাঁ।"

"এবার তাহলে উঠি," বলে ঘর থেকে বেরিয়ে সোমেন গুপ্ত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলেন।

আমিও সোমেন গুপ্তর পিছু পিছু নীচে নামতে লাগলাম। নামতে নামতে মনে হল এই মহাকাশ-বিজ্ঞানীর মাথা খারাপ বলে যে রটনা হয়েছে তা সত্যি নয়, একেবারে মিথ্যে।

নীচে নেমে এবার খুব বিনয়ের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলাম, ''পাপনে পৌঁছতে আপনার কতদিন লাগবে?"

সোমেন গুপ্ত আমার দিকে না তাকিয়ে উত্তর দিলেন, "দু-তিন ঘণ্টা লাগবে।"

আমি চমকে উঠলাম, "মাত্র দু-তিন ঘণ্টা!"

সোমেন গুপ্ত হাঁটতে হাঁটতে পোড়ো জমিতে পা দিয়ে বললেন, ''এই চেয়ারটা কিছু দূর উঠে আলোর গতিতে যাবে। সেকেন্ডে আলোর গতিবেগ কত তা জানা আছে নিশ্চয়।"

আমি বিহ্বল হয়ে বললাম, ''তা জানি। জানি বলেই ভাবছি কী করে যাবে? আলোর গতিতে গেলে এই মহাকাশ-যান তো একটা শক্তিতে পরিণত হবে। মহাকাশ-যান আর থাকবে না।"

সোমেন গুপ্ত এবার চেয়ারে বসে আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে বললেন, ''এটার তা হবে না। যেমন দেখছ, এমনিই থাকবে। পাপন গ্রহের বৈজ্ঞানিকদের এটা একটা বিস্ময়কর কীর্তি।"

এরপর আমি আর কোনও কথা খুঁজে পেলাম না।

সোমেন গুপ্ত এবার বললেন, ''আচ্ছা, আসি তাহলে। আবার দেখা হবে।"

"কবে ফিরবেন?"

"আজ রাত ন'টায় অর্থাৎ ওদের ঘড়িতে সকাল দশটায় সম্মেলন শুরু হবে। কিন্তু কবে শেষ হবে তা বলতে পারি না। সুতরাং কবে ফিরব..." বলেই চেয়ারটার দুই হাতলে জোরে চাপ দিলেন। দিতেই চেয়ারটা ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠে গিয়ে আবার সেই মোচার মতো হয়ে গেল। সোমেন গুপ্ত তার মধ্যে ঢাকা পড়লেন।

(পরের পৃষ্ঠাটি পড়ুন)



পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

[আগে যা ঘটেছে : সন্তু আর কাকাবাবু এবারে অভিযানে এসেছেন হিমালয়ে, এভারেস্ট চূড়ার দিকে। এক সময় শেরপা ও মালবাহকেরা ইয়েতির মতন একটা বিশাল জানোয়ার দেখতে পেয়ে পালিয়ে যায়। শুধু মিংমা নামে একজন শেরপা আবার ফিরে আসে। কাকাবাবু অয়ারলেসে খবর পাঠালে রানা এবং ভার্মা নামে দু'জন সরকারি অফিসার আসেন সাহায্য করতে। তাঁদের সঙ্গে সন্তুরা সামনের দিকে এগোতে থাকে, হঠাৎ এক সময় কাকাবাবু অদৃশ্য হয়ে যান, মাটিতে পড়ে থাকে রক্ত আর একটা ক্রাচ। সন্তু আর মিংমা আশ্রয় নেয় একটা গম্বুজের মধ্যে, রানা আর ভার্মা ফিরে যান আরও সাহায্য আনার জন্য। তারপর—]

॥ ১৭ ॥

সন্তু সারা রাত না ঘুমিয়ে ছটফট করল। কাকাবাবু কী করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। মানুষ কখনো অদৃশ্য হতে পারে না। কাকাবাবু নিশ্চয়ই কোনো খাদের মধ্যে পড়ে গেছেন। অথচ, সেখানে কাছাকাছি কোনো গাছের চিহ্নও নেই।

মাঝে মাঝে তন্দ্রার মধ্যে সন্তু একটা স্বপ্নই দেখতে লাগল বারবার। সে নিজে যেন বরফের মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে, তারপর এক সময় তার পা ঠেকে যাচ্ছে লোহার পাতের মতন কোনো শক্ত জিনিসে।

তারপর তন্দ্রা ভেঙে গেলেই সন্তুর মনে হয়, এটা তো স্বপ্ন নয়, সত্যি। সে সত্যিই তো একবার বরফের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল এই রকম ভাবে।

ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে সে মিংমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলল।

মিংমা ঘুমোয় একেবারে পাথরের মতন, আবার একটু ডাকলেই সে তড়াক করে উঠে বসে। দুহাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, সন্তু সাব, তুমি নিদ যাওনি?"

সন্তু বলল, "মিংমা, কাকাবাবু যেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, সে জায়গাটা তুমি তো খুঁড়ে দেখলে। সেখানে পাথর ছিল, লোহার মতন কিছু দেখতে পাওনি?"

মিংমা বলল, "না, সন্তুসাব, শুধু পাথরই ছিল।"

"ঠিক বলছ?"

"এ কী সন্তুসাব, তোমায় আমি ঝুট বলব কেন?"

"আমার যে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না! আচ্ছা মিংমা, আমি একদিন যেখানে বরফের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলাম, সেই জায়গাটা তোমার মনে আছে?"

"সেখানে তো একটা রুমালের নিশানা রেখে এসেছিলাম, কী জানি সেটা বরফে চাপা পড়ে গেছে কি না। বাতাসেভি উড়ে যেতে পারে।"

"চলো, এক্ষুনি সেই জায়গাটা খুঁজে বার করতে হবে!"

"কিন্তু আংকলসাব যেখান থেকে গায়েব হয়ে গেলেন, সেখান থেকে তো ও জায়গাটা বহুত দূরে!"

"তা হোক! তবু সে জায়গাটা পেলেই আমার চলবে।"

"সন্তুসাব, আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। বরফকা নীচে পে পাথর থাক কি লোহা থাক, তাতে কী ফারাক আছে?"

"বরফের নীচে পাথরই থাকে, লোহা থাকে না। যদি লোহার পাত থাকে, সেটা অস্বাভাবিক। সেটা ভাল করে দেখা দরকার। চলো, শাবল-গাঁইতি নিয়ে আমরা এখুনি বেরিয়ে পড়ি।"

"এখুনি? আগে হেলিকপটার আসুক। রানাসাব আর ভার্মাসাব ওয়াপস আসবেন বলেছেন।"

"ওদের আসতে যদি দেরি লাগে? তার আগে চলো, আমরা জায়গাটা খুঁজে দেখি!"

"তার আগে একটু চা খেয়ে নিই কম সে কম? এতনা ঠাণ্ডার মধ্যে একটু চা না খেলে যে হাত-পা চলবে না!"

"তাহলে তাড়াতাড়ি চা বানাও!"

গম্বুজের মধ্যে জিনিসপত্র সবই আছে। স্পিরিট স্টোভ জেবলে মিংমা গরম জল চাপিয়ে দিল।

সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে হাত - পা ছুঁড়ে লাফাতে লাগল জোরে জোরে। এতে

শরীরের আড়ষ্টতা কাটে, খানিকটা গা গরম হয়।

একবার সে ভাবল, মিংমার চা তৈরি হতে হতে সে বাইরে গিয়ে একটু ছুটে আসবে গম্বুজটার চারদিকে।

সে গিয়ে গম্বুজটার দরজা খুলতে যেতেই মিংমা বলল, "দাঁড়াও সন্তুসাব, একেলা যেও না, আমরা দুজনে সাথ সাথ বাইরে যাব!"

সন্তু বলল, "আমি বেশিদূরে যাচ্ছি না, এই বাইরে একটুখানি!"

সন্তু লোহার দরজাটা খুলল। তারপর খুব সাবধানে মুখ বাড়াল বাইরে। এখনো ভাল করে রোদ ওঠেনি, বাইরে নরম, ঠাণ্ডা আলো। দূরে কালাপাথর পাহাড়টার রং এখন লালচে হয়ে গেছে।

দরজাটা ভাল করে খুলে সন্তু এক পা বাইরে এসে দাঁড়াল। কেন যেন অকারণেই তার গা ছমছম করছে। চারিদিক এমন নিস্তেজ বলেই বুঝি ভয় হয়। রাত্তির-বেলাও কোনো শব্দ শোনা যায়নি।

ডান দিকে তাকিয়েই সন্তু চমকে উঠল। গম্বুজের পাশের চাতালে এক গাদা মুর্গির পালক ছড়ানো। শুধু পালক নয়, চোখ আর চামড়া সমেত মুর্গির মুণ্ডুও দু-তিনটে।

সন্তু চাপা গলায় ডাকল, "মিংমা—"

তারপর আর উত্তরের অপেক্ষা না করে সে দৌড়ে চলে এল ভেতরে।

মিংমা তখন চা ছাঁকতে শুরু করেছে, সন্তুকে দৌড়ে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল, "কেয়া হুয়া?"

সন্তু বলল, "পালক, অনেক পালক..."

মিংমা কিছুই বুঝতে পারল না। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী বললে সন্তুসাব? পালক? কিসকা পালক? পালক দেখে তোমার ডর লাগল?"

সন্তু বলল, "মুর্গির পালক। এখানে এল কী করে? কারা যেন মুর্গির গলা মুচড়ে মেরেছে!"

মিংমা প্রথমে মাথা নিচু করে একটু ভাবার চেষ্টা করল। তবু ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, "চা ঠাণ্ডা হো জায়গা। আগে চা পিয়ে লাও!"

সন্তু চায়ের গেলাসটা ধরে রাখতে পারছে না, এমনই হাত কাঁপছে তার! সব ব্যাপারটাই তার কেমন যেন ভুতুড়ে লাগছে। সে হলপ করে বলতে পারে, কাল বিকেল পর্যন্ত ওখানে কোনো মুর্গির পালক ছিল না। তাছাড়া এই বরফের দেশে মুর্গির পালক আসবেই বা কী করে?

চায়ের সঙ্গে সঙ্গে গোটা দশেক বিস্কুট খেয়ে ফেলল মিংমা। তারপর প্রায় বিড়ির সমান একটা চুরুট বার করে ধরিয়ে আরামে দুবার টান দিয়ে বলল, "এবার চলো তো সন্তুসাব, দেখি কোথায় তোমার মুর্গির পালক।"

সন্তু আর মিংমা বেরিয়ে এল বাইরে। হাওয়ায় মুর্গির পালকগুলো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। আস্ত মুণ্ডু থেকে চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মনে হয় কেউ যেন ওদের গলা টিপে মেরেছে।

মিংমা একটা ছোট্ট শিস দিয়ে বলল, "বড়ি তাজ্জব কি বাত! ইধার মুর্গা কোউন লায়ে গা? জিন্দা মুর্গা!"

তারপর তারা দুজনেই একসঙ্গে পরের জিনিসটি দেখতে পেল। বরফ মেশা বালিতে টাটকা পাঁচ-ছটা খুব বড় পায়ের ছাপ! দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকাল, একটাও কথা না বলে দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে দৌড়ে ফিরে এল গম্বুজটার মধ্যে। মিংমা দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা। নিজের বুকের ওপর এক হাত চেপে ধরে বলল, "ইয়েটি! ইয়েটি!" ইয়েটি!"

সন্তু বলল, "আমাদের কাছে রিভলভার নেই, কোনো অস্ত্র নেই!"

মিংমা আবার বলল, "ইয়েটি! ইয়েটি!"

সন্তু বলল, "ইয়েতি মুর্গি খায়! কিন্তু এখানে মুর্গি পেল কী করে?"

মিংমা খানিকটা দম নিয়ে বলল, "হেলিকপটার নেহি আনে সে...আমরা বাহার যেতে পারব না!"

সন্তু বলল, "ইয়েতিটা কি এখনো এখানে আছে? কোনো সাড়া-শব্দ শুনতে পাইনি। আচ্ছা মিংমা, ইয়েতি কি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে? মানে, ভ্যানিশ্ হয়ে যেতে পারে?"

মিংমা একটা হাত ঘুরিয়ে বলল, "কেয়া মালুম!"

তারপর আরও ঘণ্টা-দেড়েক ওরা রইল গম্বুজের মধ্যে বন্দী হয়ে। দুজনেই বসে থাকল ওপরে জানলাটার কাছে ঠেসাঠেসি করে, কিন্তু হেলিকপটারের কোনো পাত্তা নেই। ইয়েতিরও কোনো চিহ্ন নেই। সেটা কি লুকিয়ে আছে ওদের ধরবার জন্য?

সন্তুর আস্তে আস্তে ভয় কেটে গেল। একসময় তার মনে হল, এরকমভাবে চুপ-চাপ বসে থাকার চেয়ে বাইরে গিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করাও অনেক ভাল। এর আগে সে যত ইয়েতির গল্প পড়েছে, তাতে কোনো ইয়েতিই কিন্তু মানুষকে মারেনি। ইয়েতি মানুষের কাছে দেখা দিতে চায় না। এখান-কার ইয়েতি রাত্তিরবেলা গম্বুজের ধারে বসে মুর্গি খেয়ে গেছে, কিন্তু ওদের কোনোরকম বিরক্ত করেনি।

সন্তু বলল, "মিংমা চলো, বাইরে যাই!"

মিংমা বলল, "আভি? দাঁড়াও, হেলি-কপটার জরুর আসবে।"

সন্তু তাকে কিছু না বলে নেমে গিয়ে খুলে ফেলল গম্বুজের দরজাটা। মিংমাও নেমে এসে জিজ্ঞেস করল, "কী করছ, সন্তুসাব?"

সন্তু কোনো উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে



গেল বাইরে। সে লক্ষ করল, ভয়ে তার বুক কাঁপছে না আর। সে দৌড়ে গোল করে ঘুরে এল গম্বুজটা। সেখানে কেউ নেই।

সন্তু এবার বলল, "মিংমা, সেই জায়গাটা খুঁজতে যাবে?"

মিংমা বলল, "কোন জায়গা?"

"যেখানে তুমি রুমালের নিশানা রেখেছিলে।"

"আর একটু ঠারো। হেলিকপটার এসে যাক!"

"না, আর আমার দেরি করতে ভাল লাগছে না। তুমি যাবে তো চলো।"

সন্তু গম্বুজের মধ্যে ঢুকে একটা স্নো-অ্যাক্স নিয়ে বেরিয়ে এল। সে যাবেই দেখে মিংমাও অগত্যা জিনিসপত্র নিয়ে আসতে লাগল তার পিছু পিছু। সন্তু সোজা হাঁটছে দেখে মিংমা এক সময় বলল, "ডাহিনা, ডাহিনা চলো, সন্তুসাব!"

অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করল ওরা দুজনে। কোথাও সেই লাল রুমালের চিহ্ন নেই। ইয়েতির ভয়ে ওরা বারবার পেছন ফিরে চেয়ে সব দিক দেখে নিচ্ছে। আকাশে আজ বেশ চড়া রোদ, সব দিক পরিষ্কার, এর মধ্যে কারুর কোথাও লুকিয়ে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সন্তুর বারবার মনে হচ্ছিল, হয়তো এই বিশাল প্রান্তরের মধ্যে সে কোথাও কাকাবাবুকে শুয়ে থাকতে দেখবে। কাকাবাবু তো আর সত্যিই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন না।



এক জায়গায় এসে মিংমা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। সে যেন ঠিক বিপদের গন্ধ পায়। সন্তুর হাত চেপে ধরে সে বলল, "আউর যাও মত! খতরা হ্যায়!"

সেখানে বরফের ওপর শুয়ে পড়ল সে। তারপর হাতটা লম্বা করে জোরে একটা গাঁইতির ঘা দিল। অনেকখানি বসে গেল গাঁইতিটা। বুঝতে কোনো ভুল হয় না যে ঐ জায়গাটা ফাঁপা!

সন্তু দারুণ উত্তেজনা বোধ করল। পেয়েছে, এবার তারা ঠিক জায়গাটা খুঁজে পেয়েছে। এই জায়গাটাতেই সন্তু বরফের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল সেদিন।

মিংমা এদিক-ওদিক গাঁইতি চালিয়ে বুঝে নিল, ঠিক কতখানি জায়গা ফাঁপা সেখানে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বরফ কোপাতে লাগল, সন্তুও যোগ দিল তার সঙ্গে।

এখানে একটু পরিশ্রম করলেই নিশ্বাসের কষ্ট হয়। এমনিতেই এখানকার বাতাস বেশ ভারী। খানিকক্ষণ কুপিয়েই সন্তু বেশ হাঁপিয়ে গেল। কিন্তু মিংমার কী অসাধারণ শক্তি, সে কিছুতেই ক্লান্ত হয় না। এর মধ্যে সে বেশ একটা বড় চৌবাচ্চার মাপে গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে। তারপর সে গর্তের এক পাশে থেকে ঝুঁকে নীচে গাঁইতি চালাতে লাগল। একসময় সে নিজেই লাফিয়ে নেমে পড়ল গর্তটার মধ্যে।

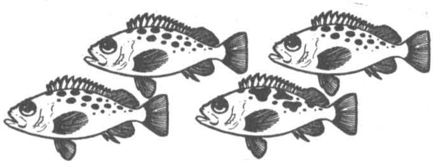
আরও কয়েকবার বেশ জোরে গাঁইতি চালাবার পর মিংমা মুখ তুলে সন্তুকে বলল, "তুম ঠিক বোলা, সন্তুসাব নীচে তো লোহা হ্যায়!"

সন্তুও তখন লাফিয়ে নেমে পড়ল গর্তটার মধ্যে। দুজনে মিলে আরও খানিকটা বালি - মেশানো বরফ সরিয়ে ফেলার পর দেখা গেল, সেখানে পাতা

ছবির মজা

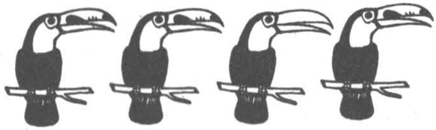


সার্কাসের ক্লাউনের এই ছবিটিকে রঙিন পেনসিল দিয়ে ভরাট করো। ছবিটা তাহলে আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।



নজর করে দ্যাখো, চারটে মাছ কি ঠিক একইরকম?

(না, নীচের ডানদিকের মাছটির গায়ের দাগ একটু আলাদা রকম।)



আবার নজর করে দাখো, চারটে পাখি কি ঠিক একইরকম?

(না, তৃতীয় পাখিটির ঠোঁটে কোনও দাগ নেই।)

রয়েছে একটা লোহার পাত। কিন্তু তাতে কবজা কিংবা গুপ্ত দরজা কিছুই নেই।

সন্তু বলল, "এখন দেখা দরকার, এই লোহার পাতটা কত বড়! এখানে বরফের তলায় কে এরকম লোহার পাত রাখবে? কোনো অভিযাত্রী-দল নিশ্চয়ই এতবড় লোহার পাত বয়ে নিয়ে আসে না!"

মিংমা কপালের ঘাম মুছল বাঁ হাতের উলটো পিঠ দিয়ে। আবার খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে! লোহার পাতটা কত বড় কে জানে! লোহার পাতটা দেখে অবশ্য মিংমাও খুব অবাক হয়েছে। একটা কোনো দারুণ রহস্যের সন্ধান পেয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে তার মাথার চুল।

আবার নতুন উৎসাহে সে বরফ পরিষ্কার করতে লাগল। লোহার পাতটা বেড়েই চলেছে। কতখানি জায়গা জুড়ে যে এটা পাতা আছে, তা বোঝার কোনো উপায় নেই।

মিংমা এক সময় জিজ্ঞেস করল, "আউর কেয়া করনা, বোলো সন্তুসাব!"

সন্তুও ঠিক বুঝতে পারছে না। এরকম ভাবে আর কতক্ষণ খোঁড়াখুঁড়ি চলবে? এ তো একজন দুজন মানুষের কাজ নয়। তবে একটা দারুণ জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে, এটাকে আর হারালে চলবে না কিছুতেই।

এই সময় খ্যার খ্যার খ্যার শব্দ শোনা গেল হেলিকপটারটার। দূরের আকাশে দেখা গেল একটা কালো বিন্দু। মিংমা আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, "আ গয়া! আ গয়া!"

কিন্তু আর কিছু বলতে পারল না মিংমা। ওরা আগে লক্ষই করেনি যে, লোহার পাতটার এক জায়গায় চুলের মতন সরু দাগের জোড়া আছে। সেই জায়গাটা ফাঁক হয়ে একটা দিক ঢালু হয়ে যেতেই সন্তু গড়িয়ে পড়ে গেল নীচের অন্ধকারে। মিংমাও পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তারই মধ্যে সে দু হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল খাদের ওপরটা।

দুটো লোহার পাতের মাঝখানে আটকে গেল মিংমার পায়ের তলা থেকে কোমর পর্যন্ত। সে যন্ত্রণায় আঁ-আঁ করে আর্তনাদ করতে লাগল।

(ক্রমশ)



লুকিয়ে আছে যেন

কুন্তক

ব্রিজের কথাই যদি বললে কাকু, তাহলে বলি, সি এম ডি এ-র জন্য কলকাতায় এখন অনেক ছোট ছোট ব্রিজ দরকার হচ্ছে।

কী-রকম?

হচ্ছে না? রাস্তায় চলতে-ফিরতে দেখতে পাও না অনেক পাটাতন ফেলে দেওয়া আছে এখানে-সেখানে? মাঝখানে ফাঁক?

টুম্পি বলল : ও, সেই ব্রিজ! সে তো আবার পাটাতন থাকেও না অনেক সময়ে, লাফ দিয়েও ডিঙোতে হয়।

আমি বলে উঠি : হয় তো? ঠিক বলেছিস। ব্রিজ নেই, তবু ব্রিজের কাজটা করিয়ে নিচ্ছে। তাই না?

ব্রিজের কাজ করিয়ে নিচ্ছে মানে?

মানে, এপার-ওপার জুড়ে গেল তো?

জুড়ল কোথায়?

জুড়ল না, কিন্তু তোর চলা দিয়ে জুড়ে দিলি তুই।

হ্যাঁ, তা ঠিক।

তার মানে, ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে না, তবু ব্রিজের কাজ হল।

একটা বিষয় নিয়ে কাকু যখন এতক্ষণ কথা বলে, তখন বুঝতে হবে কোনো মতলব আছে।

ধরেছিস ঠিক। আছে মতলব। উৎপ্রেক্ষার সেই ব্রিজটা মনে আছে টুম্পি?

যেন-র ব্রিজ তো?

আচ্ছা, অনেক সময়ে তো এমন হতে পারে যে লাফ দিয়ে রাস্তার ফাটল পার হওয়ার মতো উৎপ্রেক্ষাতেও লাফ দিলাম একটা? অর্থাৎ, 'যেন' একটা আছে হয়তো, কিন্তু দেখা গেল না তাকে। যদি এমন হয়?

তা কেমন করে হবে? যদি না-ই দেখা গেল তবে আর রইল কেমন করে?

ধর, শব্দটা বলা হল না, কিন্তু তার ভাবটা রইল।

শব্দ ছাড়া ভাব হয়?

এ কী বললি রে টুম্পি?—নন্তু চেঁচিয়ে উঠে বলল—মা যখন চোখ পাকিয়ে তাকায় দেখিস না তখন শব্দ ছাড়া ভাব?

বড্ড বাজে বকো দাদা। যেন-ছাড়া যেনটা কী-রকম হবে কাকু?

শুনবি কী-রকম? সত্যেন দত্তের 'দূরের পাল্লা' তো মনে আছে? মনে আছে 'হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো ডাইনী যেন ঝামরচুলো'? খেজুর এখানে খেজুরগাছ, সেটা নিশ্চয় মনে করিয়ে দিতে হবে না? মনে মনে দেখতে পাচ্ছিস ছবিটা?

তা পাচ্ছি, কিন্তু এ তো সেই উৎপ্রেক্ষাই হল।

হ্যাঁ, তা হল। কিন্তু ওরই পাশে শোন, 'যেন' যেখানে নেই, 'পাড়ময় ঝোপঝাড়, জঙ্গল জঞ্জাল, জলময় শৈবাল পান্নার টাঁকশাল।' এইবার?

চোখ নাচিয়ে নন্তু বলল : এক্কাগাড়ি খুব ছুটেছে। এইবার?

ওর মানে কী হল? এটা কেন বললি?

ওই-যে, এখানেও 'যেন' নেই। ঝুড়ি ঝুড়ি বলতে পারি এ-রকম।

ফাজলামো? ওটা কি আমার লাইনটার মতো হল? 'জলময় শৈবাল পান্নার টাঁকশাল'। এখানে যেন যে নেই, সেটাই বড় কথা নয়। লুকোনো একটা যেন যে আছে, সেটাই আসল। জলময় শৈবালকে যেন সবুজ পান্নার টাঁকশালের মতো দেখাচ্ছে, এই না কথা?

আরো একটা বলবে?

আরো? বেশ, 'দুই বিঘা জমি' থেকে শোন, 'স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল—নিশীথশীতল স্নেহ।' দিঘির কালোজলটা কেমন? যেন ঠাণ্ডা রাত্রির আদর।

ও, বুঝতে পেরেছি। মাঝখানে একটা 'যেন' বসিয়ে বুঝে নিতে হবে। এই তো? তাহলে কি এটা উৎপ্রেক্ষা নয়?

উৎপ্রেক্ষাই। তবে লুকোনো উৎপ্রেক্ষা। বলা নেই, তবু বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপারটা প্রতীয়মান হচ্ছে, এই আর-কী।

আবার একটা শক্ত শব্দ! প্রতীয়মান।

(ক্রমশ)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদাশিব

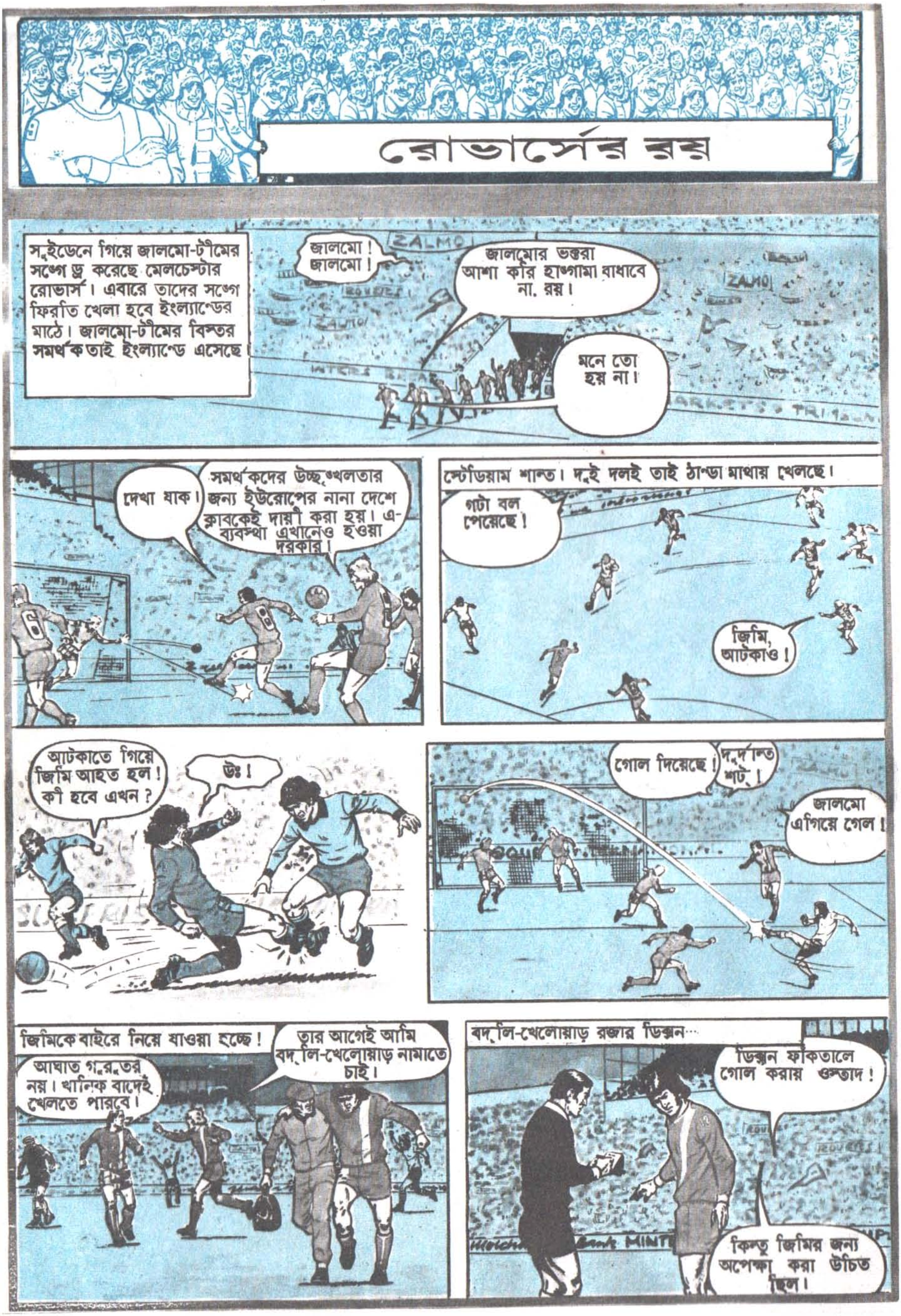
আদিকাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ





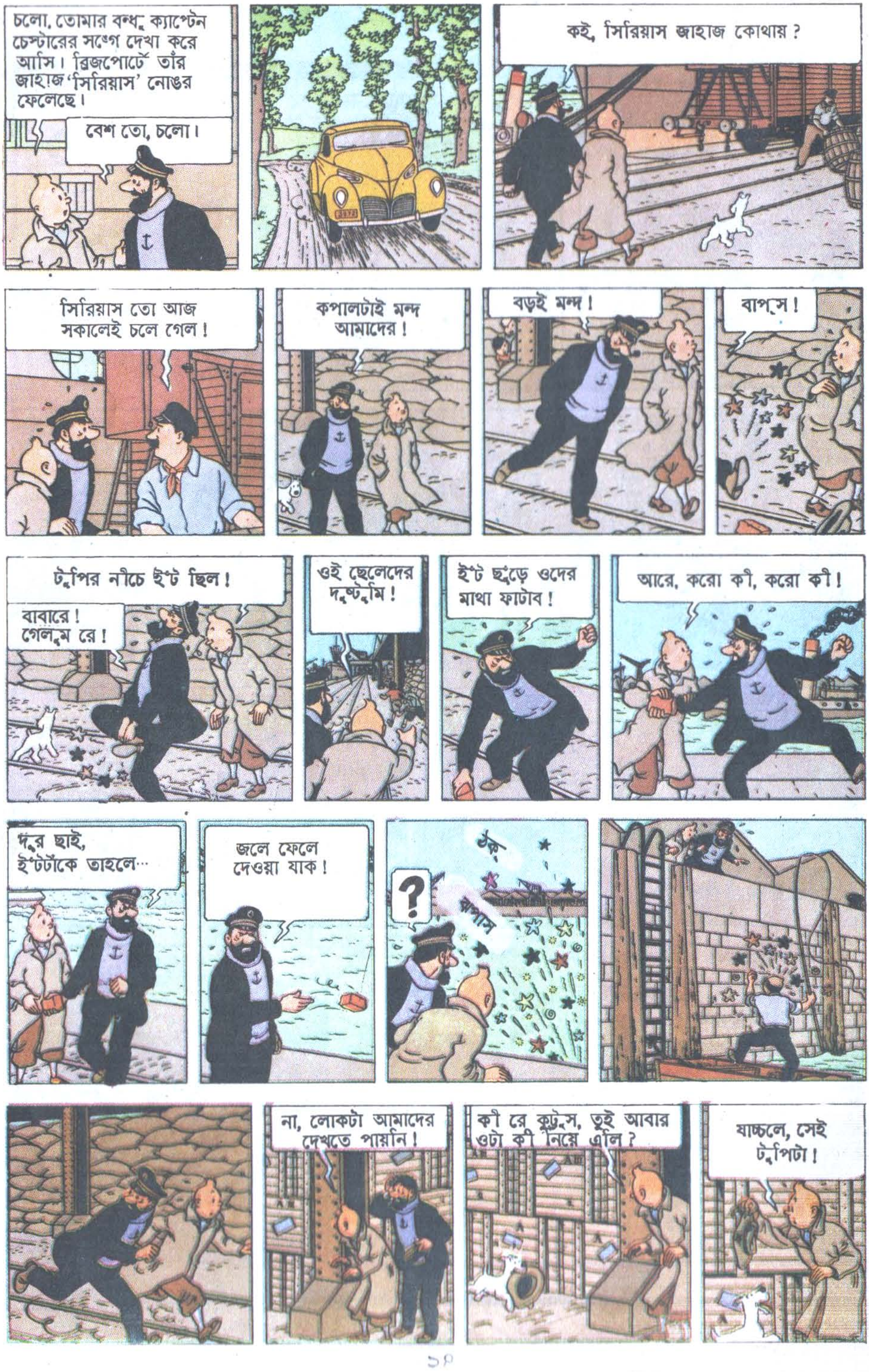
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

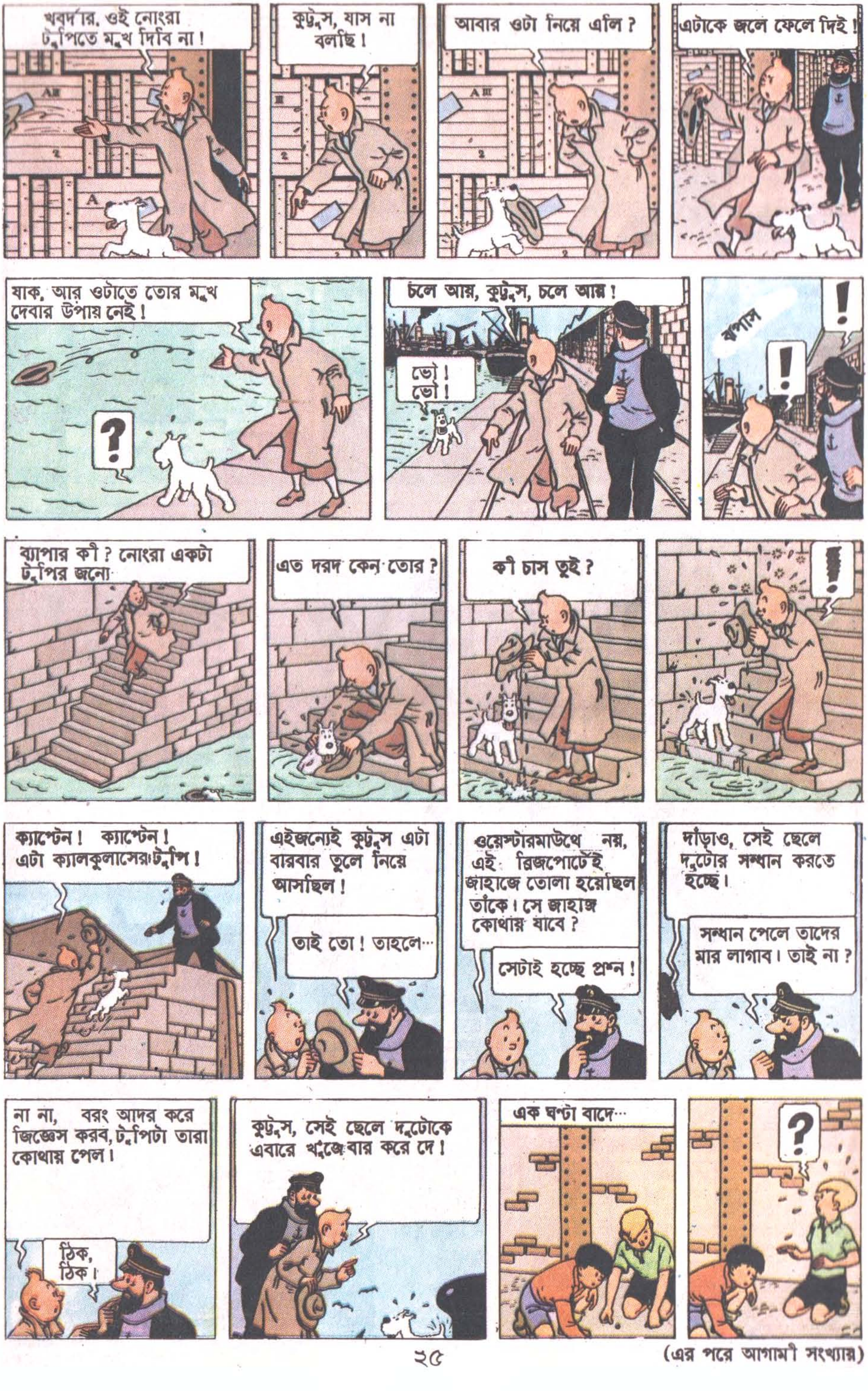


রোভার্সের রয়
সুইডেনে গিয়ে জালমো-টীমের সঙ্গে ড্র করেছে মেলচেস্টার রোভার্স। এবারে তাদের সঙ্গে ফিরতি খেলা হবে ইংল্যান্ডের মাঠে। জালমো-টীমের বিস্তর সমর্থক তাই ইংল্যান্ডে এসেছে।
জালমো! জালমো!
জালমোর ভক্তরা আশা করি হাঙ্গামা বাধাবে না, রয়।
মনে তো হয় না।
দেখা যাক।
সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ইউরোপের নানা দেশে ক্লাবকেই দায়ী করা হয়। এ-ব্যবস্থা এখানেও হওয়া দরকার।
স্টেডিয়াম শান্ত। দুই দলই তাই ঠাণ্ডা মাথায় খেলছে।
গটা বল পেয়েছে!
জিমি, আটকাও!
আটকাতে গিয়ে জিমি আহত হল! কী হবে এখন?
উঃ!
গোল দিয়েছে!
দুর্দান্ত শট!
জালমো এগিয়ে গেল!
জিমিকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে!
তার আগেই আমি বদলি-খেলোয়াড় নামাতে চাই।
আঘাত গুরুতর নয়। খানিক বাদেই খেলতে পারবে।
বদলি-খেলোয়াড় রজার ডিক্সন···
ডিক্সন ফাঁকতালে গোল করায় ওস্তাদ!
কিন্তু জিমির জন্য অপেক্ষা করা উচিত ছিল।



রয় অপেক্ষা করতে রাজি নয়।
উঃ, একটুর জন্যে!
জোর বাঁচিয়েছে!
মেলচেস্টার কর্নার পেয়েছে!
কর্নার....
দেখো, ঠিক ডিক্সনকে বল দেবে!
ভাল করে নজর রাখো!
তোমাকে গোল করতে দেব না হে!
হঠাৎ...
ভার্নন, বল দাও!
এই নাও!
রয় বল পেয়েছে!
বল পেয়েই ঘুরে দাঁড়িয়েছে রয়। তারপর
এ কী!
গোল
দুই খেলা মিলিয়ে ফলাফল এখন ৩—৩
কী, ডিক্সনকে নামিয়ে ভাল করিনি?
ডিক্সনকে ওরা সবাই আগলে রেখেছিল!
সেই ফাঁকে রয় গোল দিল!
খানিক বাদেই ফের বল পেয়েছে ভার্নন এলিয়ট!
গোল! আবার গোল!
ভার্নন আজ দুর্দান্ত খেলছে!
সমর্থকদের অভিনন্দন জানাচ্ছে রোভার্সের খেলোয়াড়রা।
রয়! রয়!
পরের খেলা 'গেট সফীল্ড গুন'দের সঙ্গে। তখন কী হবে, কে জানে।
মেলচেস্টার রোভার্সের কর্মকর্তাদের বৈঠক চলছে!
গেট্‌সফীল্ডের সমর্থকদের টিকিট বিক্রি না-করলেই তো হয়!
ঠিক কথা।
সেটা উচিত হবে না।
যে-করেই হোক কিছু টিকিট ওরা পেয়ে-ই যাবে। এবং রেগে থাকায় আরও বেশি করে হাঙ্গামা বাধাবে।
তার চাইতে বরং ওদের সমর্থকদের সবাইকেই মাঠে ঢুকতে দেওয়া হোক।
বলো কী!
এর পরে আগামী সংখ্যায়


চলো, তোমার বন্ধু ক্যাপ্টেন চেস্টারের সঙ্গে দেখা করে আসি। ব্রিজপোর্টে তাঁর জাহাজ 'সিরিয়াস' নোঙর ফেলেছে।
বেশ তো, চলো।
কই, সিরিয়াস জাহাজ কোথায়?
সিরিয়াস তো আজ সকালেই চলে গেল!
কপালটাই মন্দ আমাদের!
বড়ই মন্দ!
বাপ্‌স!
টুপির নীচে ইঁট ছিল!
বাবারে! গেলুম রে!
ওই ছেলেদের দুষ্টুমি!
ইঁট ছুঁড়ে ওদের মাথা ফাটাব!
আরে, করো কী, করো কী!
দূর ছাই, ইঁটটাকে তাহলে...
জলে ফেলে দেওয়া যাক!
?
ঠক্
ধপাস
না, লোকটা আমাদের দেখতে পায়নি!
কী রে কুট্টুস, তুই আবার ওটা কী নিয়ে এলি?
যাচ্চলে, সেই টুপিটা!



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে : জয়রামবাবুর ছেলে জ্যোতি নিরুদ্দেশ। চন্দ্রভানু চুরি করেছেন তাঁকে। জ্যোতিকে নিয়ে ট্রেনযাত্রায় মধ্যরাতে দুর্ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরে চন্দ্রভানুর। এদিকে পুলিসের-হাতে-আটক বেহুঁশ ছেলেটিকেই জ্যোতি ভেবে গ্রহণ করেছেন জয়রামবাবু, ওদিকে হাসপাতাল-পালানো স্মৃতিভ্রষ্ট আসল-জ্যোতি চান্দোলির দোকানি চৌবেজির ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। চান্দোলির সূর্যনারায়ণ জয়রামবাবুর পুরনো বন্ধু; ইতিমধ্যে কলকাতায় এসেছিলেন তিনি। চন্দ্রভানুও হারানো-জ্যোতির খোঁজে জয়রামবাবুর বাড়ির উপরে নজর রাখছেন। তারপর—

॥ ১৪ ॥

বড়ে মিয়া বললে, "এ আবার একটা কাজ নাকি?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "না, খুব সাবধানে করতে হবে কি-না, তাই বলছি।"

বড়ে মিয়া বললে, "বটা আমার শাগরেদ হুজুর। কত খুন-জখম করেছে ও, ছেলে চুরি করা তো সোজা কাজ। ক'টা ছেলে চুরি করতে হবে তাই শুধু ওকে বলে দিন। কোথা থেকে চুরি করতে হবে? ইস্কুল থেকে, না বাড়ি থেকে, না রাস্তা থেকে?"

বটা কথার মাঝখান থেকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আমার মজুরি কত পাব?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "তুমি কত চাও বলো?"

বটা বললে, "ছেলে চুরি করার রেট একটু বেশি। তার ওপর ইস্কুল থেকে চুরি করার এক রকম রেট আর রাস্তা থেকে চুরি করার রেট আর একরকম। তবে বাড়ির ভেতর থেকে ছেলে চুরি করার রেট একটু বেশি।"

"এ ছেলেটাকে বাড়ি থেকেই চুরি করতে হবে।"

বটা জিজ্ঞেস করলে, "ছেলের মা-বাপ আছে?"

"মা নেই, বাপ আছে।"

"ছেলেটা ইস্কুলে পড়তে যায় না?"

"না।"

"খেলতে-টেলতে বাইরে যায় না?"

"না। কোথাও যেতে দেয় না ছেলেটার বাবা। বাড়িতে রেখে মাস্টার দিয়ে পড়ায়। আর সব সময়ে চাকর-বাকররা পাহারা দিয়ে রাখে। সেই জন্যেই বলছি, যখন ছেলেটা রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে থাকবে, তখন চুরি করতে হবে। রাত্তির বেলা যখন ছেলেটা তার বিছানায় ঘুমোবে তখন তাকে চুরি করতে হবে। একেবারে মাঝ-রাত্তিরে, যখন সব্বাই ঘুমিয়ে অচেতন থাকবে। দেওয়াল বেয়ে দোতলায় উঠে তার ঘরের দরজা খুলে তাকে চুরি করে আনতে হবে।"

বটা বললে, "তাহলে তো খুব হুজ্জতের কাজ।"

বড়ে মিয়া বললে, "এতে আর হুজ্জত কী? সেবারে পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে যা করেছিলুম তাই করবি।"

বটা বললে, "তাহলে তো ওষুধ লাগবে। সেবারে রুমালে ওষুধ মাখিয়ে নাকের সামনে ধরতেই ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তারপর তাকে চুরি করে নিয়ে এসেছিলুম।"

বড়ে মিয়া বললে, "তা এবারও তাই করবি।"

বটা বললে, "সেবারে দু' হাজার টাকা পেয়েছিলুম, এবার অত কম টাকায় হবে না। এবারে চার হাজার টাকা চাই।—"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "তা তাই-ই দেব।"

"আগাম দু' হাজার টাকা চাই কিন্তু।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "তা তাই-ই দিচ্ছি। শেষকালে যদি কিছু গড়বড় হয় তখন কিন্তু টাকা ফেরত দিতে হবে।"

বড়ে মিয়া বললে, "না হুজুর, তা হবে না। আমি তো মধ্যেখানে আছি। আপনি বাড়ির ঠিকানা বলে দিন, আর কবে কাজ হাসিল করতে হবে বলে দিন।"

চন্দ্রভানুবাবু সবই বলে দিলেন। ছেলেটাকে কোন বাড়ি থেকে চুরি করতে হবে তাও বলে দিলেন। তারপর আগাম টাকাও দিয়ে দিলেন। যেমন কথা হয়েছিল তেমনি সব কাজ হবে। বড়ে মিয়া বললে, "আমাদের কথার নড়চড় হবে না স্যার, আমি কথা দিয়ে কখনও কথার খেলাফ করি না। আমি তো মাঝখানে রইলাম, আপনি কিছু ভাববেন না।"

চন্দ্রভানুবাবু খুশি হয়ে চলে গেলেন তাঁর নিজের হোটেলের দিকে।

বড়ে মিয়া বটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "কী রে, টাকাগুলো তোর কোমরে গুঁজলি যে? আমার কমিশনটা দে।"

বটা বোধহয় টাকার ভাগ দিতে একটু কিন্তু-কিন্তু করছিল। বললে, "কত?"

বড়ে মিয়া বললে, "যা নিয়ম তাই তো দিবি। অর্ধেক। আমিই তো তোকে পার্টি জোগাড় করে দিলুম।"

"অর্ধেক দিতে হবে?"

বড়ে মিয়া বললে, "ওস্তাদের তো তাই-ই পাওনা। আমিও তো আমার ওস্তাদকে তাই-ই দিয়ে এসেছি বরাবর।"

শেষ পর্যন্ত তাই-ই দিতে হল বটাকে। বড়ে মিয়া বললে, "দেখিস, কাজ যেন হাসিল হয়, নইলে ওস্তাদের বদনাম হয়ে যাবে। তবে আমিও থাকব তোর সাথে। তুই কিছু ভাবিসনি!"

বলে সোজা চলে গেল বড়ে মিয়া।

দেবরাজ চৌবে একেবারে একলা পড়ে গেছে। ছেলেটা চলে যাবার পর থেকে তাকে নিজেকেই একলা হাতে সমস্ত কাজ করতে হয়। দোকানের মাল মহাজনের কাছ থেকে কিনে আনতে হয়, আবার দোকানের খদ্দেরও সামলাতে হয়। কিন্তু তারই ফাঁকে-ফাঁকে এক-একদিন ছেলেটাকে দেখতে যায়।

সূর্যনারায়ণবাবু যেদিন হাসপাতাল থেকে ছেলেটাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে চলে গেছেন সেইদিন থেকেই চৌবেজির কাজ বেড়ে গেছে। তার আগে বেশ ছিল। খদ্দের সামলাতে পারত ছেলেটা।

জমিদারবাবুর বিরাট বাড়ি। চৌবেজিকে দেখে সূর্যনারায়ণবাবু জিজ্ঞেস করতেন, "কী গো চৌবেজি, কারবারটারবার কেমন চলছে তোমার? দেবুকে দেখতে এসেছ?"

চৌবেজি বলত, "আজ্ঞে হুজুর, হ্যাঁ।"

সঙ্গে সঙ্গে বড়বাবু ডেকে পাঠাতেন দেবুকে। দেবু আসত।

বড়বাবু বলতেন, "এই দেখ দেবু, কে এসেছে।"

চৌবেজি দেখত, দেবুও চেয়ে দেখত। কিন্তু ছেলেটা যেন ক্রমে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। একদিন যে চৌবেজিই তাকে

আশ্রয় দিয়েছিল, সে-কথা যেন সে ভুলেই গিয়েছিল। যখন বড়বাবু সকালবেলা গঙ্গা-স্নান করে ফিরতেন, তখন সঙ্গে থাকত ওই দেবদত্ত। শখ করে তার ওই নামই দিয়েছিলেন বড়বাবু। চৌবেজির দোকানের সামনে দিয়ে বাড়ি ফেরবার রাস্তা। সব দিন দেখা হত না বড়বাবুর সঙ্গে। কিন্তু যেদিন দেখা হত সেদিন বরাবরের মতো হাত জোড় করে বড়বাবুকে প্রণাম করত।

জিজ্ঞেস করত, "দেবু আপনাকে কোনও কষ্ট দিচ্ছে না তো হুজুর?"

বড়বাবু বলতেন, "কী বলছ তুমি চৌবে? আমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমার তো আরাম হয়েছে। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর তো আমার কিছু করবার ছিল না! এখন তবু আমি একটা করবার মতো কাজ পেয়েছি।"

তা সত্যিই বুড়ো বয়েসে করবার মতো একটি কাজ পেয়েছিলেন বড়বাবু। তাঁর গৃহিণীরও বয়েস হয়েছিল।

চৌবেজি জিজ্ঞেস করত, "লেখা-পড়া কিছু শেখাচ্ছেন নাকি ওকে?"

বড়বাবু বলতেন, "কী বলছ তুমি? লেখা-পড়া শেখাব না? ওকে মানুষ করব বলেই তো রেখেছি আমার কাছে। একজন মাস্টারমশাই রেখেছি ওর জন্যে। তোমার কাছে থাকলে তো আর সেটা হত না!"

চৌবেজি বলত, "না হুজুর, আমার কাছে থাকলে ও মুখ্যু হয়েই থাকত! কার ছেলে, কোথা থেকে আমার ঘাড়ে এসে পড়ে-



ছিল। এখন আপনার মতো একজন মহাপুরুষের হাতে গিয়ে ও বাঁচল। এটাও ওর কপাল! তা এখন নিজের নাম-ধাম, নিজের বাড়ির কথা কিছু বলতে পারে?''

''না, তা এখনও বলতে পারে না। শুধু বলে হাসপাতালে পুলিসের ভয়ে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু কেন যে হাসপাতালে ছিল তাও বলতে পারে না।''

তা বলতে না-পারুক, তাতে কারোরই কিছু আসে যায় না। বড়বাবুকে দেবুও বড়বাবু বলে ডাকত। যে কাজ করতে বড়বাবু একবার মানা করতেন সে-কাজ আর করত না সে। কিন্তু হঠাৎ এক-একদিন এক-একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসত। একদিন কোথাও কিছু নেই একজন অন্ধ-মানুষকে এনে হাজির করলে। বললে, ''বড়বাবু, এ লোকটা চোখে দেখতে পায় না, একে পাঁচটা টাকা দাও।''

বড়বাবু দেখলেন লোকটা সত্যিই অন্ধ। জিজ্ঞেস করলেন, ''একে তুই কোথায় পেলি?

দেবু বললে, ''রাস্তা দিয়ে লোকটা লাঠি ধরে ধরে যাচ্ছিল আর ভিক্ষে করছিল। আমার কাছে তো পয়সা ছিল না। এর জন্যে আমার বড় কষ্ট হল বড়বাবু, তাই আমি একে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।''

বড়বাবু অন্ধ লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন, ''তুমি থাকো কোথায়?''

লোকটা বললে, ''কোথায় আর থাকব বাবু, যেখানে জায়গা পাই সেখানেই থাকি।''

''তোমার দেশ কোথায়?''

''সম্বলপুরে।''

''সম্বলপুরে দেশ যদি তো এখানে এলে কী করে?''

''হেঁটে হেঁটে।''

''হেঁটে হেঁটে এই চান্দোলিতে এসেছ? এখন এখান থেকে কোথায় যাবে?''

লোকটা বললে, ''যেদিকে ভগবান আমাকে নিয়ে যান সেদিকেই যাব। সব জায়গাই তো ভগবানের রাজ্য। আমার তো কোথাও যেতে মানা নেই।''

''তোমার কে কে আছে?''

''কেউ নেই বড়বাবু। কেউ নেই বলেই তো ভগবান আমার কোনও দুঃখ রাখেননি।''

কলকাতার কোথায় কি হচ্ছে

গেলবার নতুন নতুন উপনগরী তৈরীর কথা বলেছিলাম তোমাদের। এও যেমন কলকাতা উন্নয়নের একটা দিক, তেমনি আবার বস্তী উন্নয়নও আর একটা দিক।

শহর কলকাতা দিন দিন লোকের ভীড়ে উপচে উঠছে। থাকবার জন্যে বাসা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কাজেই গরীব মানুষ বস্তীতে জায়গা করে নিয়েছেন। তাই কলকাতাবাসীর প্রতি তিনজনের একজন হলেন বস্তীবাসী।

বৃহত্তর কলকাতায় প্রায় তিন হাজারের মত রেজিষ্টার্ড বস্তী আছে। আর এগুলোতে বাস করেন ২৫ লক্ষ লোক। এইসব বস্তীতে পানীয় জল, পাকা রাস্তা, বিদ্যুতের আলো, স্যানিটারি পায়খানা এই ধরণের কিছু নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবস্থা করছে সি, এম, ডি, এ। দেড় হাজারেরও বেশী বস্তীতে কাজ হয়েছে এ পর্যান্ত। আরও কাজ চলছে।

কিন্তু শুধু বস্তীতে আলো, জল, পায়খানা, রাস্তা করে দিলেই শেষ হচ্ছে না। বস্তীতে যাঁরা বাস করছেন তাঁদের আর্থিক অবস্থার যদি উন্নতি না হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বস্তীগুলো পরিচ্ছন্ন থাকছে না।

তাই বস্তীবাসীদের জন্যে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এজন্যে ব্যবসা, জিনিসপত্র তৈরীর কারখানার জন্যে কিছু কিছু ঋণ দেওয়া হচ্ছে। যাতে তাঁরা স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন।

আশা করা যায় এইভাবে কাজ চালিয়ে গেলে কলকাতার বস্তীগুলো পরিচ্ছন্ন আর সেখানকার মানুষেরাও স্বনির্ভর হয়ে উঠবেন। তাছাড়া যে সব উপনগরী সি, এম, ডি, এ বানাচ্ছে (বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলী, পূর্ব কলকাতা আর কোণায়) সেখানে দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরাই অগ্রাধিকার পাবেন।

পরের বার জলসরবরাহ ও গঙ্গানগরে যে নতুন গোশালা নির্মাণ হচ্ছে সে বিষয়ে বলবো।

(সি, এম, ডি, এ জনসংযোগ বিভাগ, ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

"চোখ নেই বলে তোমার মনে কোনও দুঃখ নেই?"

অন্ধ লোকটা বললে, "দুঃখ থাকবে কেন হুজুর। যাদের চোখ আছে তারাই কি সুখী? এত দিন ধরে আমি তো অনেক জায়গাতেই গেলাম, অনেক লোকের সঙ্গে মিশলুম, অনেক লোকের অনেক কথা শুনলুম। আমি দেখেছি কেউ আমার মতো সুখী নয়। আমি ছাড়া সকলেই দুঃখী।"

বড়বাবুর কানে কথাগুলো নতুন লাগল। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন. "সত্যিই তোমার কোন দুঃখ নেই? এই যে তোমার বাড়ি-ঘর কিছু নেই, এই যে তুমি ভিক্ষে করে পেট চালাচ্ছ তার জন্যে তোমার কোনও কষ্ট নেই?"

লোকটা বললে, "না বড়বাবু, বিশ্বাস করুন, আমার সে-জন্যে কিছুই কষ্ট নেই। যাদের সবকিছু আছে, যাদের বাড়ি-ঘর আছে, যাদের অনেক সম্পত্তি আছে তারা আমাকে বলেছে তাদের অনেক কষ্ট। তাদের টাকা-কড়ি চুরি হয়ে যাবার ভয় আছে, তাদের মামলা মকদ্দমা আছে, কিন্তু আমার ও-সব কিছু নেই বলেই আমার কোনও কষ্ট নেই।"

বড়বাবু জামার পকেট থেকে একটা পয়সা নিয়ে অন্ধ লোকটার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, "নাও, এই পয়সাটা নাও—"

লোকটা পয়সা নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল। হঠাৎ দেবু ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলল, "একটা পয়সা দিচ্ছ? বললুম পাঁচটা টাকা দিতে!"

বড়বাবু বললেন, "পাঁচ টাকা? একটা ভিখিরিকে পাঁচ টাকা কেউ দেয়? আমার অত টাকা নেই।"

দেবু বললে, "তোমার টাকা নেই? তোমার কি টাকার অভাব? একে পাঁচ টাকা তোমাকে দিতেই হবে!"

বড়বাবু বললেন, "তোর তো অদ্ভুত আবদার দেখছি! না, পাঁচটা টাকা আমি দিতে পারব না।"

"না, তোমাকে দিতেই হবে, নইলে আমি আজ ভাতই খাব না।"

মহা মুশকিলে পড়লেন বড়বাবু। শেষ পর্যন্ত পাঁচটা টাকা নিয়ে তবে অন্ধ লোকটা চলে গেল! বড়বাবু কী আর করবেন। ছেলেটার ওপর মায়া পড়ে গেছে তাঁর। সে না খেয়ে উপোস করে থাকবে, এটা তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

গৃহিণী বলতেন, "তুমি লাই দিয়ে দিয়েই ওর মাথাটা খাবে! কোথাকার কে একটা রাস্তার ছেলে, তাকে বাড়িতে নিয়ে এসে তুলেছ, এখন ঠ্যালা বোঝো।"

সত্যিই মায়া পড়ে গিয়েছিল বড়বাবুর। ছেলেটাকে প্রথম দেখার পর থেকেই কেমন ভাল লেগে গিয়েছিল তাকে। তারপর যখন দেখলেন একদিন তাঁর জন্যেই ছেলেটা নিজের প্রাণ বিপন্ন করে অন্যায়ের প্রতিকার করবার চেষ্টা করলে, তিনি তখন হাসপাতালের সমস্ত খরচ নিজে যোগালেন। আর তারপরই তাকে নিজের বাড়িতে এনে তুললেন।

সেদিন সেইরকম একটা কাণ্ড ঘটল। কথা নেই বার্তা নেই একদিন একটা জটাজুটধারী সাধুকে এনে হাজির।

বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এ আবার কাকে আনলি রে তুই? কে এ?"

দেবু বললে, "এ একজন হিমালয়ের সাধু। একে পঞ্চাশটা টাকা দিতে হবে। এ কম্বল কিনবে, শীতে থর-থর করে কাঁপছে এ।"

বড়বাবুর মাথায় একেবারে বজ্রাঘাত! জানা নেই শোনা নেই কোথাকার কে, তাকে দিতে হবে পঞ্চাশ টাকা?

বড়বাবু সাধুটাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমার ছেলের কাছে কম্বল চেয়েছ?"

সাধুটা বললে, "আমি কিছুই চাইনি বাবুজি! আপনার ছেলে নিজেই এ-বাড়িতে ডেকে নিয়ে এল আমাকে—"

দেবু বললে, "হ্যাঁ, ও কিছু চায়নি। ঠাণ্ডায় ওর কষ্ট হচ্ছিল দেখে আমি ওকে তোমার কাছে ডেকে নিয়ে এলুম। তুমি ওকে একটা কম্বল কেনবার টাকা দাও—"

বড়বাবু প্রথমে মনে মনে খানিকটা রেগে গেলেন, কিছু বললেন না। তারপর আলমারি থেকে পঞ্চাশটা টাকা বার করে এনে সাধুটাকে দিলেন। সে টাকা নিয়ে চলে গেল। দেবু খুব খুশি! সে যে পরের উপকার করতে পেরেছে তাতেই সে খুব খুশি।

সাধুটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল হাঁটতে হাঁটতে। হঠাৎ একজন দারোয়ান এসে ধরলে তাকে। বললে, "টাকাগুলো দাও।"

ছোটদের যত সেরা বই



সুনির্মল বসুর ‘ছন্দের টুং টাং’ এমন একটি বই যা একদিকে হাজির করছে নানান মজাদার ছড়া ও কবিতা, আবার একই সঙ্গে শিখিয়ে দেবে, কী করে লেখা যায় এমন সব আশ্চর্য লেখা। স্টেশনের ‘পুরী-মিঠাই’ বা ‘চা-গরম’ আওয়াজ, রাস্তার ‘কুলপী মালাই’ হাঁক, শেয়ালের হুক্কাহুয়া, পায়রার বকবকম, ঘুঘুর ঘু-ঘু, ‘একটি পয়সা দে মা’ বলে ভিক্ষে চাওয়া—আমাদের চেনা-শুনা এমন বহু কিছুকে—বলতে গেলে প্রায় সব কিছুকে—কীভাবে ছড়ায় আনা যায়, ছন্দে-মিলে মজাদার করে তোলা যায় সেই কৌশলই খুব সহজভাবে শিখিয়েছেন ছন্দের জাদুকর সুনির্মল বসু।



শেখর বসু এক গা-শিরশির-করা অ্যাডভেনচার উপন্যাস লিখেছেন, নাম ‘সোনার বিস্কুট’। টাবলু, জয় ও শংকর—এই তিন বন্ধু স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পর তিব্বতী জাদু শিখবে বলে নেপাল যাবে ঠিক করল। ট্রেনে এক রহস্যময় বৃদ্ধ যাত্রীকে দেখল ওরা। হাতে-পায়ে প্লাসটার করা, যন্ত্রণায় কাতর বৃদ্ধটি ট্রেন থেকে নেমে দিব্য দৌড়ে গেলেন। এর ভিতরে কী রহস্য রয়েছে তা জানতে গিয়ে তিন বন্ধু জড়িয়ে পড়ল এমন এক জালে যেখান থেকে প্রাণে বেঁচে ফেরাই কঠিন। কী করে ওরা জয়ী হয়ে ফিরল তাই নিয়েই এই দুর্ধর্ষ উপন্যাস।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও **বিমল দাসের** সাদা বাঘ ১০ **অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর** শাদা ঘোড়া ৮ **অজেয় রায়ের** ফেরোমন ৬ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬ **গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু** ও **ময়ূখ চৌধুরীর** নিশীথ রাতের আহ্বান ৩ **গৌর-কিশোর ঘোষের** দুষ্টুর দুপুর ৪ **আনন্দ বাগচীর** বনের খাঁচায় ৬ **মনোজ বসুর** ওস্তাদ নটবর ৬ **শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক ৪ **শিশির করের** গঙ্গায় বাঘ ৪ **লীলা মজুমদারের** বাতাসবাড়ি ৫ **অমরনাথ রায়ের** দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী ১০ **আশাপূর্ণা দেবীর** রাজ-কুমারের পোশাকে ৪ **সমরেশ বসুর** মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৬ **অমিতাভ চৌধুরীর** তেপান্তরের মাঠে ৪ **গিরিধারী কুণ্ডুর** টংসা চু ৫ **বিমল মিত্রের** রাজা হওয়ার ঝকমারি ৮ **শিশিরকুমার মজুমদারের** তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫ **অন্নদাশংকর রায়ের** হৈ রে বাবুই হৈ ৫ **মঞ্জিল সেনের** ডাকাবুকো ৫ **রেবন্ত গোস্বামীর** অরুমিতুদের কথা ৪ **সুবোধ ঘোষের** সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৫ **সত্যজিৎ রায়ের** নানা স্বাদের কাহিনী : এক ডজন গপ্‌পো ১০ আরো এক ডজন ১০ ফটিকচাঁদ ৮ **শিবরাম চক্রবর্তীর** হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪ শিব্রামের বারো আড়ি ৫ দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৬ **পূর্ণানন্দ চট্টো-পাধ্যায়ের** মাধুরীলতার চিঠি ৫ **নারায়ণ চক্রবর্তীর** হলদে সবুজ কৃষ্ট্যাল ১০ **সমরজিৎ করের** একটি সংকেতের জন্যে ৬ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** তপন চরিত ৬ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** গোসাঁই-বাগানের ভূত ৮ **মতি নন্দীর** ননীদা নট আউট ৫ স্ট্রাইকার ৬ স্টপার ১০ কোনি ৭ **বিমল করের** ওআণ্ডার মামা ৬ কাপালিকরা এখনও আছে ৭ রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো জীপের রহস্য ১০ **সত্যজিৎ রায়ের** গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য-উপন্যাস : বাদশাহী আংটি ৬ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৬ সোনার কেল্লা ৬ বাক্স-রহস্য ৬ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৬ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫ জয়বাবা ফেলুনাথ ৬ ফেলুদা এন্ড কোং ৮ গোরস্থানে সাবধান ৮ **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ভয়ঙ্কর সুন্দর ৬ সত্যি রাজপুত্র ৬ তিন নম্বর চোখ ৫ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৬ সবুজ দ্বীপের রাজা ৫ ডুংগা ৭ জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ ৮ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৬ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬ সমগ্র কিশোর সাহিত্য (১ম) ২০ **প্রেমেন্দ্র মিত্রের** আগ্রা যখন টলমল ৫

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

সাধুটা অবাক। বললে, ''কোন টাকা?''

"এখুনি জমিদারবাবু যে পঞ্চাশটা টাকা তোমাকে দিলে সেই টাকাগুলো দিয়ে দাও। জমিদারবাবু টাকা ফেরত চাইতে পাঠিয়েছে আমাকে।''

সাধুটা খানিকটা হাসল। তারপর টাকাগুলো ঝোলা থেকে বার করে দরোয়ানের হাতে তুলে দিল। তারপর বললে, ''তোমার বাবুকে বোলো রামজির টাকা রামজিই ফিরিয়ে নিলে। টাকা দেবার আর টাকা নেবার মালিক তোমার বাবুজিও নয় আমিও নই।''

বলে, আবার যেমন চলছিল তেমনিই চলতে লাগল।

বাড়িতে বড়বাবু অপেক্ষা করছিলেন। দরোয়ান এসে তাঁর হাতে পঞ্চাশটা টাকা ফেরত দিলে। টাকা ফেরত পেয়ে বড়বাবু অবাক। জিজ্ঞেস করলেন, ''কীরে, সাধুটা কিছু বললে না?''

দরোয়ান বললে, "টাকা চাইতেই দিয়ে দিলে।''

বড়বাবু আরো অবাক। বললেন, "একটু আপত্তিও করলে না?''

দরোয়ান বললে, ''শুধু বললে টাকা দেবার আর টাকা নেবার মালিক তোমার বাবুজিও নয়, আমিও নই, এই কথাটা তোমার জমিদারবাবুকে বলে দিও, আর কিছু বললে না।''

বড়বাবু বললেন ''যাক গে, দেখিস, এ-কথাটা যেন খোকাবাবুর কানে না ওঠে; বুঝলি?''

দরোয়ান বললে, ''ঠিক আছে হুজুর।''

রাত তখন তিনটে। কি বড়জোর চারটে। ধর্মতলার মোড়ে কার্জন পার্কের ভেতরে চন্দ্রভানুবাবু অস্থির হয়ে পায়চারি করছিলেন। সারা রাত হোটেলের ঘরের বিছানায় ছটফট করেছেন। তারপর যখন রাত দুটো বেজেছে তখন হোটেল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কার্জন পার্কের ভেতরে এসে পায়চারি করতে আরম্ভ করেছেন। নির্জন নিরিবিলি রাস্তা। এই সময়েই এখানে জ্যোতিকে চুরি করে নিয়ে আসার কথা। সেই রকম কথাই হয়ে আছে বড়ে মিয়া আর বটার সঙ্গে। অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল। তা হোক। তাঁর জীবনে সেই সাধুটার কথাই সত্যি হবে হয়ত। নইলে সামান্য একটা ছেলের জন্যে তাঁকে এত ছটফট করে মরতে হয় কেন?

অনেক দূরে দক্ষিণ দিক থেকে একটা মোটর-গাড়ি আসবার শব্দ তাঁর কানে এল! জ্যোতিকে উদ্ধার করে হয়ত ট্যাকসিতে তুলে নিয়ে আসছে ওরা। কিন্তু না, গাড়িটা কাছে আসতেই বুঝতে পারলেন ওটা ট্যাকসি নয়, প্রাইভেট-কার। আর সেই প্রাইভেট-কার থেকে যারা নেমে এল তাদের তিনি চিনতে পারলেন। একজন বড়ে মিয়া আর একজন বটা।

তারা সামনে আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলো, ''কী হল?''

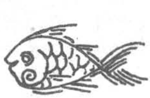
বড়ে মিয়া বললে, ''স্যার, কাম খতম।''

চন্দ্রভানুবাবু অবাক হয়ে গেলেন। এত সহজে কাজ হাসিল হয়ে গেল। অথচ তিনি কত দুশ্চিন্তা করছিলেন সমস্ত রাত ধরে। সত্যি, কলকাতায় টাকা ফেললে সব কাজই হাসিল হয়ে যায়, তাহলে!

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ''কই ছেলেটা কই?''

(ক্রমশ)

ছবি অনুপ রায়



কোশলরাজ্যে এক দুর্ধর্ষ দস্যুর অত্যাচারে প্রজারা অস্থির হয়ে উঠেছে। লোকজন মেরে তাদের সর্বস্ব লুঠ করেই ক্ষান্ত হয় না এই দস্যু, নিহতদের আঙুল কেটে নিয়ে তাই দিয়ে মালা তৈরি করে গলায় পরত সে, তাই তার নাম 'অঙ্গুলিমাল'।

গভীর বনের ভেতর দিয়ে এক সন্ন্যাসী হেঁটে চলেছেন। দেখতে পেয়ে অঙ্গুলিমাল হেঁকে বলল, "থামো।" সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে পড়লেন। অঙ্গুলিমাল মারতে এল সন্ন্যাসীকে। সন্ন্যাসীর চোখে-মুখে কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র নেই। বরং তাঁর দৃষ্টিতে ক্ষমা ঝরে পড়ছে। সন্ন্যাসীকে মারা আর হল না, অঙ্গুলিমাল হয়ে পড়ল তাঁর শিষ্য। এই সন্ন্যাসীই গৌতম বুদ্ধ।

শব্দ-সন্ধান

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
	■	৭	৮		■	
■	৯	■		■	১০	■
১১		■		■	১২	১৩
১৪		■		■	১৫	

সংকেত ঃ পাশাপাশি ঃ (১) রূপকথায় কার ঠোঁটে আগুন জ্বলে? (৩) ধর্মীয় উপাসনার আহ্বান। (৫) ইঁটের ক্ষুদ্রতম অংশ। (৬) পূর্ব-পাঞ্জাবের শহর। (৭) আকাশ আর সমুদ্রের রঙ। (১১) কুস্তি-গির। (১২) রামা আর রামমোহন দুজনেই যা হয়েছিলেন। (১৪) পাখি-বিশেষ। (১৫) চিঠির শেষ বোঝায়।

উপর-নীচ ঃ (১) বাতিদান। (২) স্বর্গের নদী। (৩) অনুর্বর মরু-ভূমি, কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধের এই অঞ্চলের খনিজ সম্পদ প্রচুর। (৪) যে-গাছের বীজ থেকে বাসন্তী রঙ হয়। (৮) যে-দেশের মানুষ ছ ইঞ্চি লম্বা। (৯) লতা। (১০) পান্থ-শালা। (১১) কার গুনগুন গান প্রাণে আতঙ্ক জাগায়? (১৩) যে-ফুলের চলতি নামে আনন্দমেলার একটি মেয়েকে তোমরা চেনো।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

জা	হা	ন	কো	শা	■	ম
■	ও	■	হি	■	■	য়
কা	দা	■	মা	লি	কা	না
ল	■	তা	■	পি	■	ম
পু	ত্ত	লি	কা	■	হা	তী
রু	■	■	ন্তা	■	মা	■
ষ	■	প	র	শ	ম	ণি

ধাঁধা

ছোটকার এক বন্ধু ব্যাঙ্কে কাজ করে।

বন্ধুটির কাজ হল, চেঞ্জ দেওয়া। চেঞ্জ কাউন্টারে বসে থাকে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত। লোকেরা এসে টাকা ভাঙিয়ে নিয়ে যায়। বদলেও নেয় অনেকে। হয়তো ক্যাশ কাউন্টারে দশ টাকার নোটে পুরো টাকা দিল. ছোটকার বন্ধুর কাউন্টারে এসে সেক্ষেত্রে হিসেব করে দশ টাকার নোটের বদলে ১০০ টাকার নোট নেওয়া যায়।

তা সেই বন্ধুটি ছোটকার কাছে



এসেছে একদিন। বহুক্ষণ ধরে গলপগুজব করে চলে গেল।

বন্ধুটি চলে যাবার পর ছোটকা আমায় ডেকে পাঠাল। আমি গেলাম।

ছোটকা বলল, "চন্দন এসেছিল আজ। বেশ মজার একটা ঘটনা বলল। ধাঁধা বলেও ভাবা যায় ব্যাপারটা। তোকে সেটা বলব। দেখি তুই পারিস কিনা।"

আমি বললাম, "দাঁড়াও, কাগজ-কলম নিয়ে আমি চট করে এক্ষুনি লিখে ফেলি। নইলে পরে হয়তো ভুলেই যাব।"

ছোটকা কিছু বলল না। হাসল একটু। আমি কাগজকলম এনে লিখতে বসলাম।

প্রথম ধাঁধা ॥ এক ভদ্রলোক ব্যাঙ্কের চেঞ্জ কাউন্টারে এসেছেন। হাতে একটা একশো টাকার নোট।

কাউন্টারের কেরানী নোটটা নিয়ে প্রশ্ন করল, "কী দেব?"

ভদ্রলোক গড়গড় করে বলে গেলেন, "কিছু দু-টাকার নোট দিন, দু-টাকার নোট যতগুলো দেবেন তার দশগুণ দেবেন এক টাকার নোট. আর বাকিটা দিন পাঁচ টাকার নোটে।"

কাউন্টারের কেরানী মহা ফাঁপরে পড়ল। এমন তাজ্জব আবদার জীবনে শোনেনি সে। চটে গিয়ে বলল, "পরিষ্কার করে বলুন কত টাকার নোট কটা চাই। নইলে দিতে পারব না।"

ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। বললেন, "এই যে বললুম, কিছু দু-টাকার নোট, তার দশগুণ এক টাকার নোট আর বাকিটা পাঁচ টাকার নোট।"

কেরানী বলল, "এ হিসেব অসম্ভব।"

তোমরা বলো, সত্যিই কি অসম্ভব? নাকি ভদ্রলোক যেভাবে চাইলেন সেভাবে দেওয়া যায় ভাঙানি। হিসেব করেই বলো না হয়।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ একটা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক। শুরু থেকেই গোনো অথবা শেষ থেকেই, ভদ্রলোক ন নম্বর লোক। কত লোক দাঁড়িয়ে সেই লাইনে?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ উপযুক্ত সংখ্যা বসাও

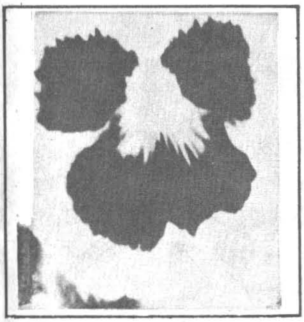
৬, ৯, ১২, ১৫,?

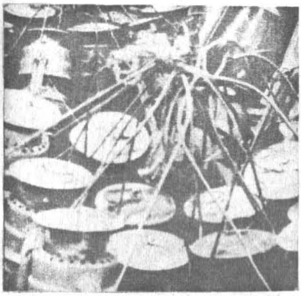
চতুর্থ ধাঁধা ॥ বেমানান কোনটি? হাতিমি, বকচ্ছপ, গিরগিটি, হাঁসজারু।

গতবারের উত্তর ॥ (১) ৯০০ লোক, ১০০টি গাড়ি (২) দক্ষিণ দিকে (৩) ১৬৮, ২৪ (৪) চিল

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো





সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল লাউডস্পীকারের ফোটো   ফোটো তপন দাস

উত্তর বটে

প্রঃ 'ঘাসের উপর দিয়া হাঁটিবেন না'—এ লেখা তো কেউ মানছে না, কী করা যায় বলুন তো?

উঃ লিখে দিন, 'এখানে দুইটি তাজা বোমা পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে।'

প্রঃ কোন্ জিনিস বাক্সেও লাগে, কানেও লাগে?

উঃ তালা।

প্রঃ নেমন্তন্ন খেতে বসলে সব সময়ই দেখি অন্য লাইনে একের পর এক আইটেম পড়ছে, আর আমাদের লাইনে লুচি-বেগুন-ভাজার পর কিছুই আসছে না. এর প্রতিকার কী বলুন তো?

উঃ এর পর থেকে অন্য লাইনে বসবে।

সুসেন

মজার খেলা

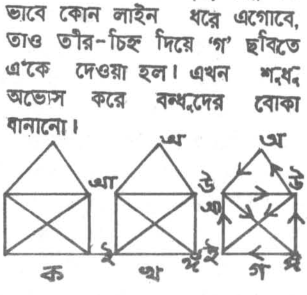
বন্ধুদের সামনে নীচের 'ক' ছবির মতন একটা খাম আঁকো। প্রথমে আঁকবে ওপরের ত্রিভুজটা, পরে নীচের চৌকো অংশ, সব শেষে কোনাকুনি লাইন দুটো।

এবার কোনো বন্ধুকে বলো, একটানে খামের ছবিটা আঁকতে হবে, কাগজের ওপর থেকে পেনসিল তোলা যাবে না, এক লাইনের ওপর দিয়ে দুবার দাগ টানা চলবে না। আরেকটা শর্ত হল, কোনাকুনি লাইন থেকে আঁকা শুরু করা যাবে না।

এত শর্ত মেনে ছবিটা আঁকতে গিয়ে বন্ধুরা প্রত্যেকেই প্রায় ব্যর্থ হবে। দু-একজন যদি-বা পারে, তা হঠাৎই।

কিন্তু তুমি সব সময় পারবে। কীভাবে? সেটাই শিখে নাও। 'খ' ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে তেমন ভাবে খামে অ থেকে উ পর্যন্ত চিহ্ন দিয়ে দাও। এখানে লিখে দেখানো হল, কিন্তু তুমি মনে-মনে হিসেব রাখবে অ থেকে উ কীভাবে বসছে, কখনো ছবিতে লিখে বন্ধুদের দেখাবে না। এবার একটা মন্ত্র মুখস্থ করো—'ঈগল ইঁদুর আরশোলা/উল্লুক অদ্ভুত আলখাল্লা/ঈশ্বর উষ্ট্র ইত্যাদি।'

ব্যস, মন্ত্রের শব্দগুলো মনে মনে বিড় - বিড় করে বলো আর প্রতি শব্দের প্রথম অক্ষর অনুযায়ী হাত চালিয়ে যাও। 'ঈ-ই-আ-উ-অ-আ-ঈ-উ-ই।' দেখবে, সব শর্ত মেনে ছবিটা কী সহজে আঁকা যাচ্ছে। ঈ থেকে শুরু করে কী ভাবে কোন লাইন ধরে এগোবে, তাও তীর-চিহ্ন দিয়ে 'গ' ছবিতে এঁকে দেওয়া হল। এখন শুধু অভ্যেস করে বন্ধুদের বোকা বানানো।



মজারু

হাসিখুশি



মোটরগাড়ি করে জগদীশবাবু চলেছেন রাঁচি থেকে ধানবাদ। কিন্তু হঠাৎ মনে হল, ভুল পথে চলে এসেছেন। একজনকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে গাড়ি থামালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "ধানবাদ যাবার রাস্তা এটাই তো?"

কিন্তু লোকটি কানে শুনতে পান না তেমন। বললেন, "কী?"

জগদীশবাবু এবার চেঁচিয়ে বললেন, "ধানবাদ যাবার এটাই রাস্তা?"

লোকটি তবু কিছু শুনতে না পাওয়ায় প্রচণ্ড চিৎকার করে বললেন, "ধানবাদ কি এ-পথে পড়বে?"

এবারেও শুনতে পেলেন না লোকটি। জগদীশবাবু কপাল চাপড়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। মাইল তিনেক চলার পর আর একটি লোক পেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি ধানবাদ যাওয়ার রাস্তা?"

লোকটি বলল, "অতবার জিজ্ঞেস করছেন কেন, আমি প্রথম বারই আপনার চ্যাঁচানি শুনতে পেয়েছি।"

ছবি অহিভূষণ মালিক



দেশ

সুমন চট্টোপাধ্যায়

ইস্কুলে কাল ভূগোলের ক্লাস-টেস্ট। সব বিষয়ের মধ্যে আবার ভূগোলই মন্নার সবচাইতে প্রিয়। তাই অন্য পরীক্ষার পড়া শুধু চোখ দিয়ে করলেও ভূগোলের বইতে ও সম্পূর্ণ মন ঢেলে দেয়।

কালকের পরীক্ষার সিলেবাস 'বাংলা দেশের নদ-নদী'। সিলেবাসে সবই প্রায় পরিচিত নদীর নাম নদীর পাশের শহরগুলোর কয়েকটাতে মন্না বাবা-মায়ের সঙ্গে বেড়াতেও গেছে। হাওড়া ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে নীচের যে নদীটাকে এতদিন ও গঙ্গা ভাবত বইতে লিখেছে তার নাম হুগলি। একবার মামাবাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার সময়, ট্রেনের জানলা থেকে ও রূপনারায়ণ আর দামোদর দেখেছে।

মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারির পা ধুয়ে দেওয়া ভাগীরথীর পাড়ে বসে মন্না ছোটকাকাদের সঙ্গে পিকনিক করেছে। কী মজা! আজকের পড়ায় কেবল সেই ছবিগুলোর সঙ্গে বইয়ের লেখার মিল খোঁজা। পাশে রাখা দুধের গ্লাস ঠাণ্ডা করতে করতে মন্না নিবিষ্ট মনে পড়ে চলছিল।

'বাংলাদেশের অপর একটি নদীর নাম পদ্মা।' বইয়ের এই লাইনটায় এসে মন্না থেমে গেল। পদ্মা? এ-নদীর নাম তো কখনও শুনিনি! ভাবল মন্না।

মন্না জানে, এ-বাড়ির কেউ যা জানে না, দাদু জানেন। যে-কোনও ইংরেজি শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করো, দাদু শুধু সেই শব্দটার অর্থই বলবেন না। কতরকম ভাবে সে-শব্দ ব্যবহার করা চলে তা-ও গড়গড় করে বলে যাবেন। কাকু তো রসিকতা করে দাদুকে বলেন 'চলমান ডিক্‌শনারি'।

দাদু এখন ইজিচেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছেন। রোজ দুপুরের আগে তিনি এইভাবে ঝিমোন। কাক-ডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠে দাদু মর্নিং-ওয়াক করতে যান। ফিরে এসে বাজার করেন। তারপর মন্নার পড়ার টেবিলের উলটো দিকের ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে

কখন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

"দাদু, ও দাদু"—মুন্না ডাকল।

নাতির ডাকে দাদুর ঘুম গেল ভেঙে। কেউ হয়তো খবরের কাগজ চাইছে এই ভেবে তিনি ঘুম-জড়ানো গলায় বললেন, "খবরের কাগজ?"

"আরে না, না। আমি বলছিলাম কি, পদ্মা নদী কোথায় তুমি জানো, আমি তো কখনও এ নদীর নাম পর্যন্ত শুনিনি।"

মুন্নার কথা শুনে দাদু হো-হো করে হাসতে শুরু করলেন। মুখে দাঁত না থাকার জন্যে হাসলে পরে দাদুকে শিশুর মতো দেখায়, ভীষণ ভাল লাগে মুন্নার। কিন্তু আজ ওর রাগ হল। ভাবল, দাদু বুঝি ঠাট্টার হাসি হাসছেন। নইলে এই সামান্য একটা প্রশ্নে অমন করে হাসার কী আছে!

"ঠিক আছে, বলতে হবে না। আমি বাবার কাছ থেকে জেনে নেব।" মুন্নার গলায় অভিমানের সুর।

"রাগছ কেন দাদুভাই। পদ্মা নদীর নাম কখনও শোননি বলে কি হেসেছি। তোমাকে যদি কেউ বলে তুমি তোমার মাকে চেনো, তুমি হাসবে না?"

"বা রে, এ আবার কেমন কথা? মাকে চেনা আর পদ্মাকে চেনা কি এক কথা হল না কি?"

"মা তো আমার খুব ছোটবেলাতেই মারা গেছেন, মায়ের মুখ আমি কখনও ভাল করে মনে করতেই পারি না। কিন্তু পদ্মা? তার কোলেই যে আমার দেশ। আমার জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় সেইখানেই কেটেছে। তার কথা ভুলি কী করে?" দাদু হাসতে হাসতে জবাব দিলেন।

"বলো না দাদু, তোমাদের দেশের গল্প।" আবদারের গলায় মুন্না বলল।

"তোমাদের কী রে, সে কি তোর দেশ নয়? যে দেশে বাপ-ঠাকুর্দা জন্মেছে সে দেশ কি তার ছেলের কাছে পরদেশ?"

"আমি তো কখনও দেশের কথা শুনিনি, তাই কোথায় আমাদের দেশ জানব কী করে বলো?"

"তা অবশ্য ঠিকই বলেছিস।"

দাদু দেশের কথা গড়-গড় করে বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সব কথার অর্থ ওর মাথায় ঢুকছিল না। মাঝেমধ্যে কয়েকটা কথা বলতে বলতে দাদু বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন



রোদ-প্রতিরোধ

চিত্তরঞ্জন দেব

রোদ, কড়া রোদ রোদে
চুল পুড়ে যায়
কালাচাঁদ ভেবে মরে
কী হবে উপায়!
কালো ছাতা ভাল নয়
রোদ টেনে আনে
সাদা ছাতা খুঁজেছিল,
নেই কোনোখানে।
ঘরের কাছেই এক
রঙের দোকানি
বলে, ভাই, ছাতা রাখা
বড় হয়রানি—
ছাতা থাকলেই থাকে
হারানোর দায়,
তার চেয়ে সাদা রঙ
লাগাও মাথায়।
বাড়ি এসে কালাচাঁদ
সাদা রঙ গুলে
লাগাল নিজের হাতে
ঘন কালো চুলে।

ছবি দেবাশিস দেব

একসময় চুপ করলেন দাদু।

দেওয়ালে একটা টিকটিকি খুব আস্তে আস্তে একটা শিকারের দিকে এগোচ্ছিল ; মুন্না হাঁ করে টিকটিকিটাকে দেখতে লাগল। বাড়ির ভিতর থেকে মায়ের আওয়াজ ভেসে এল —"মুন্না, দুধ খেয়েছ?"

এর পরের ব্যাপারটা মুন্না জানে। তাই আর কোনও দিকে না তাকিয়ে এক চুমুকে দুধের গ্লাসটা শেষ করে দিল।

"দাদুভাই, সব কথা বড় হলে বুঝবে।" দাদুর এ কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক, পরিচিত, ভয় পাওয়ার মতো নয়। মুন্না বুঝতে পারল দাদু নরম হয়ে এসেছেন।

"আচ্ছা দাদু, পদ্মা তোমাদের বাড়ি থেকে কত দূর ছিল? আমাদের বাড়ি থেকে গঙ্গার দূরত্ব যতখানি, নাকি তার চাইতেও বেশি?''

"অনেক কম, অনেক কম। বাড়ি থেকে মিনিট দশেকের পথ। সকাল-সন্ধেয় কতদিন যে পদ্মার পাড়ে গিয়ে বসেছি, জেলেদের মাছধরা দেখেছি। আর পদ্মার ইলিশ! ভাবলে এখনও জিবে জল আসে।"

"তোমরা নদীতে সাঁতার কাটতে না?"

"আমরা কাটতাম না, তবে ছেলে-ছোকরারা কাটত। এই তোর বাবাই তো একবার, ছোট-বেলায়, পদ্মায় ডুবে গেছিল বলে। সে কি আর যে-সে নদী! বর্ষাকালে এপারে দাঁড়ালে ওপার চোখেই পড়ে না।"

"কেন, বাবার পাশে ট্রেনার ছিল না? আমরা যখন সাঁতার কাটি, আমাদের পাশে তো ক্লাবের ট্রেনার বিমলদাও সাঁতার কাটে।"

আবার অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন মুন্নার দাদু। "ট্রেনার? হোঃ হোঃ হোঃ, পদ্মায় সাঁতার কাটতে ট্রেনার? বলি, মাছ যেমন জন্ম থেকেই জলে ভাসতে শেখে, আমাদের গ্রামের ছেলেপুলেরাও তেমনি বাচ্চা বয়েস থেকেই নদীতে দাপাদাপি করত। মাঝেমধ্যে দু'একটা দুর্ঘটনা যে হত না এমন নয়, তবে তা নিয়ে কেউ খুব একটা মাথা ঘামাত না।"

"এ মা, তোমরা গ্রামে থাকতে? গ্রামে তো ভোলারা থাকে?"

ভোলা মুন্নারই সমবয়সী, ওদের বাড়িতে কাজ করে। ভোলা লেখাপড়া শেখেনি, এমনকী সে অ, আ-ও পড়তে জানে না।

"গ্রামে শুধু থাকতাম না রে, গ্রামই ছিল আমাদের সব। দিনের বেলায় যেখানেই থাকি না কেন, রাত্রে গাঁয়ে ফিরতাম। কাজের তাগিদে একটা রাত্তিরও যদি বাইরে থাকতে হত, তবে সেখানকার বিছানায় ঘুম আসত না। কেবলই মনে হত কখন দেশে ফিরব।"

"আচ্ছা দাদু, গ্রামে তো মাটির তৈরি বাড়ি হয়। তোমাদের কি সেইরকম বাড়ি ছিল?"

"সবটা নয়। তবে মাটিরই হোক আর যাই হোক নিজের বাড়িতে থাকার কী আরাম, তা এই সি আই টি রোডের ফ্ল্যাটে বসে তোমরা বুঝবে না। আর শুধু কি নিজেদের বাড়ি? ধানজমি ছিল, সেখানে চাষ হত, গোয়ালে গাই ছিল, তার দুধ খেতাম। তখন এক পয়সায় দু' সের দুধ, তিন সের চাল মিলত। এসব কথা বললে বলবি দাদু গল্প বলছে।''

দাদু গল্প বলুন আর নাই বলুন, দাদুর কথা শুনতে খুউব ভাল লাগছিল মুন্নার। কিন্তু এত কথা শুনেও দাদুর দেশের চেহারাটা ঠিক কেমন হতে পারে ও কিছুতেই ঠাওর করে উঠতে পারছিল না।

"বলি দেশে গেলে, কাজ করবে কে শুনি?" মুন্না বুঝতে পারল ভোলাকে মা ধমক দিচ্ছেন।

ভোলাও জানে এ-বাড়িতে কোথায় আবদার করলে ফল হয়। মায়ের কাছে বিশেষ আমল না পেয়ে ভোলা তাই সোজা মুন্নার পড়ার ঘরে এসে বলল, "দাদু পরশু আমার দাদার বিয়া। আমি দেশে যাব, মা যেতে দেচ্ছে না।"

"সে কী রে, দেশে যাবি ভাল কথা, কিন্তু কার সঙ্গে যাবি?" দাদু মায়ের চাইতে অনেক নরম গলায় প্রশ্ন করলেন।

"কেন, একাই যাব।''

এবার মুন্নার খিলখিল করে হাসার পালা। পেট-ফাটা হাসি হাসতে হাসতে মুন্না বলল, "একা যাবি? স্টেশনের নাম পড়বি কী করে? দেশে যেতে গিয়ে ভুল জায়গায় নেমে পড়িস যদি?"

মুন্নার কথায় ভোলা বেশ অবাক হল। ও বলল, "বা রে, আমার দেশ আমি চিনব না? সেখানে আমার দাদা গরু চরায়, ইস্টিশানের পাশের দিঘিতে মা বাবুদের বাড়ির কাপড় কাচে।"

এই প্রথম মুন্নার মনে হল ভূগোল বিষয়টা মোটেই ভাল নয়। নইলে, যে-দেশের কথা মুন্না ক্লাসের সেকেন্ড বয় হয়েও কিছু জানে না, তার কথা ভোলা জানল কী করে?

ছবি মদন সরকার



খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ৩৮ ॥

সিনিয়রিটি অনুযায়ী নতুন অধিনায়কের উপর টীমের দায়িত্ব দেওয়া মোহনবাগান ক্লাবের সাধারণ নীতি। বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যতিক্রম ঘটেছে। যেমন ফুটবলের প্রবাদপুরুষ গোষ্ঠ পাল অধিনায়ক ছিলেন ছয় বছর—একুশ থেকে ছাব্বিশ সাল পর্যন্ত। পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন পর্যন্ত অধিনায়ক ছিলেন মান্নাদা। তারপর কিন্তু প্রতি বছরই নতুন অধিনায়ক হয়েছেন। সত্তারদা, স্বরাজ চ্যাটার্জি, সমর ব্যানার্জি (বদ্রুদা) ও সুশীল গুহের পর ষাট সালে অধিনায়ক হয়েছিলুম আমি। আমার বেলায়ও ব্যতিক্রম ঘটল। পাঁচ বছর অধিনায়ক থাকার পর পঁয়ষট্টি সালে আমি মুক্তি পেলুম এবং খুবই খুশি হলুম জারনেল সিংকে দলের নেতৃত্বে দেখে।

ফুটবল-দলের নেতৃত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে আমি সত্যিই খানিকটা হাল্কা হয়ে গিয়েছিলুম। কেননা ফুটবল ও ক্রিকেটের টানা-পোড়েনে আমার পক্ষে ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা যেন সম্ভব হচ্ছিল না। ওই পঁয়ষট্টি সালের কথাই বলছি। মোহনবাগান টীম ডুরাণ্ড কাপ খেলতে গেল দিল্লিতে। জামশেদপুরে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ খেলার জন্য আমি দলের সঙ্গে যেতে পারলুম না। আবার ওই সময়েই কলকাতায় খেলতে এসেছিল শক্তিশালী এক বিদেশী ফুটবল টীম। নাম স্লোভান ব্রাতিস্লাভা। চেকোস্লোভাকিয়ার দারুণ টীম। রঞ্জি ট্রফির খেলার জন্য আমি আই এফ এ দলেও খেলতে পারলুম না ব্রাতিস্লাভার বিরুদ্ধে। পরে অবশ্য মোহন-বাগানের সঙ্গে ম্যাচটিতে খেলেছিলুম। খেলা শেষ করেই আবার উড়ে গিয়েছিলুম দিল্লিতে ডুরাণ্ডের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল্ল খেলতে। এটা পঁয়ষট্টি ও ছেষট্টির সন্ধিকালের কথা। ডুরাণ্ড শুরু হয়েছিল পঁয়ষট্টির ডিসেম্বরে। শেষ হয়েছিল ছেষট্টির জানুয়ারি মাসের নয় তারিখে।

তখন ক্রিকেটের দিকে আমার ঝোঁক বেশি দেখেই বোধহয় জারনেল মরসুমের শুরুতে অধিনায়ক হয়ে আমাকে বলেছিল, "চুনীদা, তুমি যদি আমাকে গাইড না করো, সিরিয়াসলি না খেলো, তবে আমার পক্ষে তো মুশকিল হবে।" আমি বলেছিলুম, "এ কী কথা জারনেল, আমি যতদিন খেলব, সিরিয়াসলিই খেলব। যখন সিরিয়াস ফুটবল খেলতে পারব না, নিজেই সরে যাব। তুমি ক্যাপ্টেন হয়েছ, এতে আমি সত্যিই দারুণ খুশি। ক্লাব তো আমাদের সকলের। কোনো চিন্তা কোরো না, সবাই জানপ্রাণ দিয়ে খেলব। আমাদের সামনে তো রেকর্ডও অপেক্ষা করছে।"

পঁয়ষট্টি মরসুমটা আমাদের গর্বের মরসুমই হয়েছিল। মোহনবাগান ক্লাব লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এবং ডুরাণ্ড কাপ জিতেছিল। ওই বছর পর পর চার বছর লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান—পর পর দুই বছর অপরাজিত থেকে। এবং উপর্যুপরি ছয় বছর ডুরাণ্ড ফাইনাল খেলে পাঁচবার জয়ের



বল হাতে মাঠে নামছেন জারনেল। পিছনে চুনী



মোহনবাগানের উপর্যুপরি তিনবার ডুরান্ড জয়ের পর সিমলা ট্রফি ও ডুরান্ড ট্রফি হাতে চুনী ও শ্রীধীরেন দে

মধ্যে টানা তিন বছর ডুরান্ড জয়। ওর আগে দুটি মিলিটারি দল শুধু পর পর তিন বছর ডুরান্ড জয়ী হয়েছে। তিরানব্বুই-চুরানব্বুই-পঁচানব্বুইয়ে হাইল্যান্ড লাইট ইনফ্যান্ট্রি এবং সাতানব্বুই-আটানব্বুই-নিরানব্বুইয়ে ব্ল্যাক-ওয়াচ। মোহনবাগানের পরে এখনো আর কোনো দল টানা তিন বছর ডুরান্ড কাপ জিততে পারেনি।

ডুরান্ড ফাইনালের শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে-সঙ্গে জারনেল ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, "চুনীদা, তোমার মাথার টুপিতেই আর একটি পালক উঠল। আমি নিমিত্ত মাত্র।"

জারনেল সিং যাই বলুক, ও কিন্তু সেদিন ছিল মাঠের শের। ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিসকে আমরা হারিয়েছিলুম ২—০ গোলে। প্রথম গোলটি করেছিল দিপু দাস। দ্বিতীয়টি আমি। পাঞ্জাব পুলিস আমাদের তেমন বেগ দিতে পারেনি। বেগ দিয়েছিল অন্ধ্র পুলিস। সেমিফাইনালে। তিন দিন লড়াই করতে হয়েছিল। প্রথম দিনের খেলা ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয় দিন আমরা প্রায় হারতে বসেছিলুম, জুলফিকারের দেওয়া গোলে। আমিই গোলটি শোধ করে দিয়ে খেলায় সমতা আনি। তৃতীয় দিন আমরা ২—১ গোলে জিতে টানা ছয় বছর ফাইনালে উঠি। আমাদের পক্ষে পেনাল্টি কিক থেকে জারনেল প্রথম গোল করে। আর একটি করে অরুময়। অন্ধ্র পুলিসের আবদুল্লা একটি গোল শোধ করে দেয়। তিন দিনই জোর খেলা হয়েছিল।

পাঞ্জাব পুলিসের সঙ্গে ফাইনাল খেলার দিনের একটি ঘটনা মনে পড়ছে।

তখন পাঞ্জাবের ফুটবল এত উন্নত ছিল না। দলও ছিল না এত বেশি। এখন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, লীডার্স ক্লাব, জে সি টি —সব দলই শক্তিশালী। তখন কোনো দলেরই সৃষ্টি হয়নি। পাঞ্জাবের নামী ফুটবল বলতে যারা, সবাই খেলত পাঞ্জাব পুলিস দলে। ওই বছরই তারা প্রথম ডুরান্ড ফাইনালে উঠল।

দিল্লিতে পাঞ্জাব দলের অসংখ্য সমর্থক। মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল দিল্লিতে যখন পাঞ্জাবের কোনো দলের সঙ্গে খেলে তখন পাঞ্জাবি সমর্থকরা চেঁচিয়ে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলকে দাবিয়ে রাখে। ওই পঁয়ষট্টি সালে কিন্তু তাদের সাপোর্ট কিছুটা আমাদের দিকেও ছিল পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার জারনেল সিং আমাদের দলের অধিনায়ক ছিল বলে। তবু দিল্লির বেশির ভাগ মানুষের সমর্থন ছিল পাঞ্জাব পুলিসেরই প্রতি। ওই বছর ডুরান্ড কমিটীর প্রেসিডেন্টও ছিলেন বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক অর্জুন সিং। তার ফলে দিল্লির জওয়ানরাও পাঞ্জাব পুলিসের সমর্থক হয়ে পড়েছিল।

ফাইনাল খেলার আগের দিন রাত্রে

জারনেল ও আমার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। ঠিক করলুম সকালেই এয়ার চীফ মার্শাল অর্জন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে 'বায়ুভবনে' যাব তাঁর শুভেচ্ছা চাইতে।

সকালে বায়ুভবনে উপস্থিত হতেই খবর পেয়ে অর্জন সিং হাসিমুখে এগিয়ে এসে সাদরে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। চায়ের হুকুম দিয়ে জারনেলকে বললেন, "জারনেল, আজকের খেলায় কিন্তু আমি তোমাদের সাপোর্টার নই।" জারনেল চটপট উত্তর দিল, "সেইজন্যই তো সাতসকালে আমি ও চুনীদা আপনার শুভেচ্ছা চাইতে এসেছি। পাঞ্জাবের খেলোয়াড়রা তো আপনার কাছে আসেনি। আপনি আমাদের শুভেচ্ছা জানাবেন না?" এয়ার চীফ মার্শাল আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, "আর ইউ গোয়িং টু বী পলিটিসিয়ানস আফটার ইওর ফুটবল ক্যারিয়ার কাম্‌স টু অ্যান এণ্ড?" খেলা ছাড়ার পর তোমরা কি রাজনীতি করবে? আমি বললুম, "তেমন কোনো ইচ্ছে আমাদের নেই।" ততক্ষণে চা এসে গেছে। পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে অর্জন সিং বললেন, "ইউ আর ভেরি ক্লেভার। ও কে। লেট দি বেটার টীম উইন।"

ফাইনাল খেলায় আমাদের জয়ের পর অর্জন সিং অভিনন্দনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের মোহনবাগান ও পাঞ্জাব পুলিসের খেলোয়াড়দের জন্য এয়ারফোর্স ক্যাম্পাসে ডিনারের আয়োজন করেছিলেন। ডিনার টেবিলে ছোট এক বক্তৃতায় পাঞ্জাব পুলিসের খেলোয়াড়দের দিকে চেয়ে অর্জন সিং বলেছিলেন, "তোমরা এগারোজন সিং বাঙালের একজন সিংকে হারাতে পারলে না।" সকলে হো-হো করে হেসে উঠল।

পঁয়ষট্টির ডুরাণ্ড জয় আমার কাছেও স্মরণীয় হয়ে আছে। কারণ ওর পর বাংলার বাইরে আর কোনো প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে আমি খেলিনি। প্রদর্শনী ম্যাচে অবশ্য খেলেছি। সাতষট্টিতে দিল্লিতেই খেলেছি রাষ্ট্রপতির দলে লামার হাণ্টের ডালাস টর্নাডো দলের বিরুদ্ধে। আমিই ছিলুম রাষ্ট্রপতির দলের অধিনায়ক।

লামার হাণ্ট কে জানো? যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের। উনিই প্রথম আমেরিকায় ফুটবল খেলাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেন দু হাতে পয়সা খরচ করে।

ওই মরসুমে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল এবং স্লোভান ব্রাতিস্লাভার সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচের কথা বলা হয়নি।

শীল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে আমরা হেরে গিয়েছিলুম ০—১ গোলে। দুরন্ত শটে দেখার মতো এবং মনে রাখার মতো গোলটি করেছিল অসীম মৌলিক। কিন্তু আমি বলব, মোহনবাগানের পরাজয়ের মূলে ছিল ইস্টবেঙ্গলের গোলকীপার থঙ্গরাজ। সেনা বিভাগের চাকরি ছেড়ে থঙ্গরাজ কলকাতায় আসে। মোহনবাগান থেকে ওই বছরই যায় ইস্টবেঙ্গলে। ও যে কত উঁচুদরের গোলকীপার সেটা দেখাবার জন্যই যেন ওই ফাইনালে অসাধারণ খেলে। এর আগে আমি থঙ্গরাজের ভুলচুকের কথা বলেছি। কিন্তু এই ফাইনাল খেলার দিন ছয় ফুটের উপর মাথায় উঁচু মানুষটা যেন বারো ফুট উঁচু হয়ে গিয়েছিল। সেই অনুপাতে বেড়ে গিয়েছিল তার হাতের নাগাল। খেলার বেশি সময় আমরা ইস্ট-



ডুরাণ্ড-জয়ের পরে ট্রফি নিয়ে খেলোয়াড়দের বিজয়-দৌড়



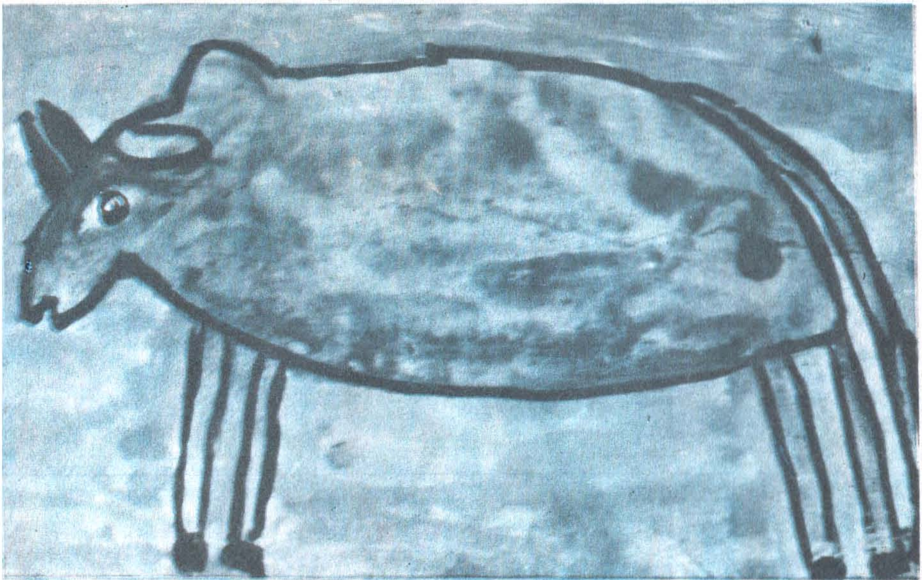
ডালাস- টর্নাডোর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে

বেঙ্গলকে চেপে রেখে আক্রমণ করেছিলুম। কিন্তু জমি ঘেঁষেই গোলে শট করি, উপর দিয়েই করি আর পাশ দিয়েই করি, থঙ্গরাজ ইস্টবেঙ্গল গোলে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের লক্ষ্যভেদের অন্তরায় হয়ে। ওর অমন খেলা আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সেনা বিভাগের শিক্ষার ফলেই থঙ্গরাজ ছিল খুব ডিসিপ্লিনড ফুটবলার। আমাকে 'ক্যাপ্টেন' বলে ডাকত। আমি চটপট সায় দিয়ে বলতুম, "ইয়েস ব্রিগেডিয়ার।" কারণ সে ছিল আমার চেয়ে সিনিয়র খেলোয়াড় এবং ব্রিগেডিয়ারের পদমর্যাদা ক্যাপ্টেনের উপরে।

জানতুম চেকোস্লোভাকিয়ার স্লোভান ব্রাতিস্লাভা খুব শক্তিশালী দল। এ-ও জানতুম, দলের অধিনায়ক এমন একজন বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলার যাঁর চেয়ে বড় ফুটবলার আগে ভারতে আসেননি। আমি স্টপার পপলুহারের কথা বলছি। ইংল্যান্ডে ফুটবলের শতবার্ষিক উৎসবের বিশেষ ম্যাচে পপলুহারই ছিলেন বিশ্ব একাদশ দলের স্টপার। ওই সূর্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল ব্রাতিস্লাভার টীম। সত্যিই দারুণ টীম ছিল। তাই আই এফ এ একাদশকে ৫—১ গোলে এবং আমাদের মোহনবাগানকে ৫—০ গোলে হারিয়েছিল সহজ ছন্দের বিজ্ঞানসম্মত ফুটবল খেলে। খেলা হয়েছিল রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। ছেষট্টির জানুয়ারি মাসের চার তারিখে আমাদের সঙ্গে যেদিন খেলা হয় তার আগেরদিন বিকালে মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা দিল্লি থেকে ফিরে এসেছে ডুরান্ডের সেমিফাইনাল খেলা বাকি রেখে। আমি ফিরে এসেছি জামশেদপুর থেকে রঞ্জি ট্রফির খেলা শেষ করে।

ক্রিকেট ও ফুটবলের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে এক খেলা থেকে আমার অন্য খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ব্যাট-বল ছেড়ে ফুটবল। তাও আবার অমন একটি শক্তিশালী ফুটবল দলের সঙ্গে। খেলতে খেলতে হাড়ে-হাড়ে আমরা ক্লাসের তফাতটা টের পেয়েছিলুম। চেক খেলোয়াড়দের স্পীড, মুভমেন্ট, ট্যাকল, কভারিং ও শুটিং এত ভাল ছিল যে, আমরা মোটেই গুছিয়ে খেলতে পারিনি। আনন্দবাজার পত্রিকায় ওই ম্যাচের রিপোর্টের যে কাটিং আমার কাছে আছে তার এক জায়গায় রয়েছে ঃ "সারা খেলায় মোহনবাগানের একটি মাত্র শটের কথাই বলা যেতে পারে। সে-শট চেক দলের সুন্দর শটের সঙ্গে তুলনীয়। শটটি করেছিলেন চুনী গোস্বামী, দ্বিতীয়ার্ধের তেরো মিনিটে। খেলার ফল তখন ১—১ হতে পারত। ক্রসবারের একটু উপর দিয়ে শটটি বেরিয়ে যায়।" কিন্তু তোমরাই বলো, আমাদের ৫—০ গোলে অমর্যাদাকর হারের কতটুকু গ্লানি দূর করতে পারে ওই প্রশংসাবাণী?

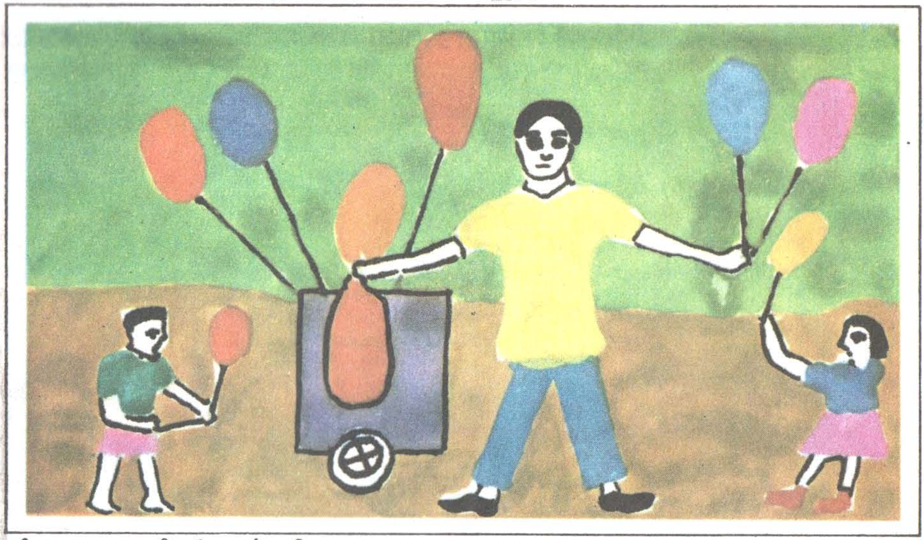
আবার ক্রিকেটের মধ্যে ডুবে গেলুম। ইংল্যান্ডের কাউন্টি চ্যাম্পিয়ন উরস্টার দল বিশ্ব-সফরে বেরিয়ে ওই সময়ই কলকাতায় এসেছিল গোটা-দুই ম্যাচ খেলতে। ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেট লীগ কবে থেকে শুরু হয়েছে জানো? আঠারোশো চৌষট্টি সাল থেকে। উরস্টার প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয় ঠিক একশো বছর পরে, উনিশশো চৌষট্টিতে। পঁয়ষট্টিতে হয় আবার চ্যাম্পিয়ন। তারপরে বার হয় বিশ্ব-সফরে। জানই তো ওদের ক্রিকেট মরসুম গরমকালে, ফুটবল শীতকালে। ঠিক আমাদের উল্টো। ওরা এসেছিল আমাদের শীত-মরসুমে। দলে ছিলেন নাম-ডাকের পাঁচ-ছয়জন টেস্ট ক্রিকেটার। সে-কথা লিখব পরের সংখ্যায়। (ক্রমশ)



ছবি এঁকেছে সুমন বসু (বয়স ৮)

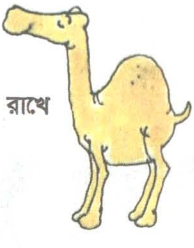


ছবি এঁকেছে অহনা মিত্র (বয়স ৫)



ছবি এঁকেছে অনির্বাণ চৌধুরী

উট



উট মরুভূমিতে থাকে
পিঠের মধ্যে জল লুকিয়ে রাখে
বালি যখন গরম হয়
দিতে পারে না ছুট,
উটের জন্যে কিনতে হবে
দু'জোড়া গামবুট।
সোহিনী দাশগুপ্ত (বয়স ৭)

মা



মা আমার জননী;
আমায় খুব ভালবাসে,
যা কিছু বলি না কেন,
সব সময়ে হাসে।
মানসী পাল (বয়স ৭)

বিয়েবাড়ি



বিয়েবাড়ি হৈ-চৈ
বসে বসে খাই দৈ।
যত পাই তত খাই
খেয়েদেয়ে মাঠে যাই।
মাঠে যত ছেলেমেয়ে
ওঠে তারা স্লিপ বেয়ে।
নীপমঞ্জরী বর্মণ (বয়স ৫)

ঝুম



আমার বোনের নাম রুমঝুম, আদুরে নাম ঝুম। ঝুম দারুণ ছটফটে, একটুও চুপ করে বসতে পারে না। ওটা ভাঙছে, এটা ফেলছে, সেটা নষ্ট করছে।

ঝুম একদিন মায়ের কাছে দারুণ বকুনি খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি এখুনি মরে যাব।"

তাই শুনে মা একটু হেসে বললেন, "ঝুম, স্নান করতে যাও।"

ঝুমের সাড়াই নেই। মা অনেকক্ষণ ধরে ডেকে ডেকে থেমে গেলেন। আমি আর দিদিও ওকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছিলাম না।

অনেকক্ষণ পর ঝুম উঠে বসে মাকে বলল, "তুমি তো আচ্ছা বোকা, মরে গেলে কেউ কি স্নান করতে পারে?"

মা একটু হেসে বললেন, "তুমি এবার বেঁচে উঠেছ তো? যাও, লক্ষ্মী মেয়ের মতো স্নান করে এসো, চিংড়িমাছ রান্না করেছি যে।"

ঝুমকে আর দ্বিতীয়বার বলতে হল না, ও ছুটে বাথরুমে ঢুকে গেল।
চিত্রলেখা বসু (বয়স ১১)

বাতিঘর

প্রদীপকুমার দত্ত

বাতিঘরের ইতিহাস আসলে প্রকৃতির অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের লড়াইয়ের ইতিহাস। যেদিন থেকে মানুষ খাবারের খোঁজে সমুদ্রে বেরিয়েছে, সম্ভবত সেদিন থেকেই বাতিঘরের ধারণার জন্ম হয়েছে। কারণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সূর্য ডোবার আগে নাবিকেরা ঘরে ফিরতে না পারলে তাদের আত্মীয়স্বজনেরা তীরে আগুন জ্বালিয়ে ঘরের নিশানা দেখাত। আগুন জ্বালিয়ে নিশানা দেখানো থেকেই গড়ে উঠেছে আজকের দিনের বাতিঘর-বিজ্ঞান।

ঐতিহাসিকদের মতে পৃথিবীর প্রাচীনতম লাইটহাউস হল ফারো অব আলেকজান্দ্রিয়া। গ্রীক 'ফারো' শব্দের অর্থ আলো। এই থেকেই ফারোলজি বা বাতিঘর-বিদ্যা। ফারো অব আলেকজান্দ্রিয়া যিশুর জন্মের প্রায় তিনশো বছর আগে তৈরি হয়েছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে এক ভূমিকম্পে এটি ধ্বংস হয়।

আজকের এই গল্পের নায়ক যে লাইট-হাউস সেটি তৈরি হয়েছিল সতেরো শতকের শেষের দিকে।

আটলান্টিক মহাসাগরের যে অংশ ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের মাঝে রয়েছে তাকে ইংলিশ চ্যানেল বলে। সেই ইংলিশ চ্যানেলে এক জায়গায় একটা আধডোবা পাহাড় আছে। প্লাইমাউথ বন্দর থেকে পাহাড়টির দূরত্ব চোদ্দ মাইল। পাহাড়টির মধ্যিখানের চুড়োর নাম এডিস্টোন রক। ইংরেজি এডি শব্দের অর্থ ঘূর্ণি। এই পাহাড়ের চারদিকের জল সবসময়ই বিপজ্জনকভাবে পাক খেতে থাকে বলেই পাহাড়টার ওইরকম নাম। জোয়ারের সময় আবার পাহাড়ের চুড়ো প্রায়ই জলে ডুবে যায়। সুতরাং এই জায়গাটাকে চেনা খুব মুশকিল। এর পাশ দিয়ে অসংখ্য জাহাজ যাতায়াত করে। বহু জাহাজ ওই মারাত্মক ঘূর্ণিতে পড়ে ধ্বংস হয়েছে।

যুগ যুগ ধরে এডিস্টোন রক ছিল নাবিকদের কাছে ভয়ংকর এক বিভীষিকা। যে মানুষটি এই আতঙ্ক থেকে নাবিকদের মুক্ত করার প্রথম চেষ্টা করলেন তাঁর নাম বাতিঘরের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা আছে পথিকৃৎ



লাইটহাউস এঞ্জিনীয়ার হিসেবে। ইনি হলেন হেনরি উইনস্ট্যানলি।

পেশায় জাহাজ-ব্যবসায়ী উইনস্ট্যানলির কাজ ছিল ছবি-আঁকা আর পাথর কেটে মূর্তি গড়া।

১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। উইনস্ট্যানলির একান্ন বছর বয়স। সে সময় তাঁর দুটি জাহাজ এডিস্টোন রকে ধাক্কা খেয়ে ধ্বংস হয়। উইনস্ট্যানলি তখন ঠিক করলেন যে, ওই রকের ওপর একটি আলোকস্তম্ভ বানাতে হবে।

কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি কাজ শুরু করলেন ১৬৯৫ সালের জুনে। পরিকল্পনা এবং পরিচালনার দায়িত্ব ছিল উইনস্ট্যানলির ওপর। জোয়ারের সময় ওই পাহাড়ের যে চুড়োটা জলের ওপর জেগে থাকত তার ওপর গ্রানাইট পাথরের বারো ফুট ভিত তৈরি হল। পাথরগুলো মাপমতো কেটে প্লাইমাউথ বন্দর থেকে জাহাজে করে ওই পাহাড়ে নিয়ে আসা হত।

এই কাজ চলার সময় ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শত্রুর হাত থেকে কর্মীদের রক্ষা করার জন্যে একটি যুদ্ধ-জাহাজ ওই পাহাড়টির কাছাকাছি থাকত। একদিন কোনো কারণে সেই জাহাজটা পাহারায় না থাকার জন্যে ফরাসী সৈন্যরা উইনস্ট্যানলিকে বন্দী করে নিয়ে যায়। ঘটনার বিবরণ শুনে ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই সেই সৈন্যদের শাস্তি দিলেন। তারপর উইনস্ট্যানলিকে প্রচুর পুরস্কার দিয়ে ইংল্যান্ডে ফেরত পাঠাবার সময় তিনি একটি ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন। সেটি হল : I am at war with England, not with humanity.

তিন বছর ধরে অবিরাম চেষ্টার ফলে বিশ্বের সর্বপ্রথম মাঝ-সমুদ্রের বাতিঘর তৈরি হল। এডিস্টোন রক লাইটহাউস ১২০ ফুট উঁচু মাথা তুলে দাঁড়াল। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর তার মাথায় কঠিন চর্বির তৈরি মোমের আলো জ্বালালেন উইনস্ট্যানলি।

পাঁচ বছর ধরে এই বাতিঘরের আলোর সংকেত ওই অঞ্চলের সমুদ্রগামী জাহাজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করল।

১৭০৩ সালের ২৬ নভেম্বর। সকাল-বেলায় উইনস্ট্যানলি সদলে এলেন লাইট-হাউসে। উদ্দেশ্য : বাতিঘর পর্যবেক্ষণ আর বাঁধাধরা কিছু মেরামতির কাজ করা।

সে-রাত্রে ইংল্যান্ডের পশ্চিম-উপকূল দিয়ে বয়ে গেল প্রলয়ঙ্কর এক ঝড়। বিস্তর বাড়ি-ঘর, গাছপালা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ডাঙায় মারা গেল প্রায় দেড়শো মানুষ। আর, সমুদ্রে ১৫০টি জাহাজডুবিতে প্রাণ হারাল ৮,০০০ নাবিক ও যাত্রী।

সেদিন সন্ধেবেলায় নিয়মমাফিক এডিস্টোন রকের বাতিঘরের আলো জ্বলেছিল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল এডিস্টোন রক তার আদিম চেহারা ফিরে পেয়েছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বিশ্বের প্রথম 'ঢেউয়ে-ভেজা' বাতিঘর। আর, সেই সঙ্গে চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছেন বিশ্বের প্রথম লাইটহাউস এঞ্জিনীয়ার হেনরি উইনস্ট্যানলি।

শোনা যায়, উইনস্ট্যানলির খুব ইচ্ছে ছিল—প্রচণ্ড এক ঝড়ের রাত তিনি তাঁর লাইটহাউসে কাটাবেন!

ইতালির বিজ্ঞানী শিয়াপারেলি মঙ্গলগ্রহের গায়ে কতগুলো দাগ দেখে মনে করলেন সেগুলো খাল। এর পরে মার্কিন বিজ্ঞানী পার্সিভেল লাওয়েলও দূরবিন দিয়ে এমনি সব দাগ দেখতে পেলেন। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, মঙ্গলগ্রহের প্রাণীরাই সেচের কাজে এইসব খাল কেটেছে। আর যেহেতু হিসেবমতো খালগুলো ৫০ থেকে ২০০ মাইল চওড়া আর ৩০০ মাইল পর্যন্ত লম্বা, মঙ্গলগ্রহের প্রাণীরা নিশ্চয়ই পৃথিবীর মানুষের চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী এবং বিজ্ঞানে অনেক উন্নত। পরে বিজ্ঞানীরা শক্তিশালী দূরবিন দিয়ে মঙ্গলগ্রহে খালের কোনো চিহ্নই দেখতে পেলেন না। খাল দেখার ব্যাপারটা তাই বিজ্ঞানীদের কাছে হয়ে দাঁড়াল Lowell's folly।

পথে সাবধান

প্রসাদ

পিকনিক সেরে চম্বল যখন বাড়ি ফিরবার জন্যে রওনা হল, তখন বিকেল হয়ে গেছে। এবার তার সাইকেল চালানো মা যদি দেখতেন তো খুব খুশি হতেন। জীবনে কোনো দিন সে এত সাবধানে সাইকেল চালায়নি। সকাল-বেলায় যে দৃশ্যটা দেখেছিল, সেটা তখনো তার চোখের সামনে ভাসছিল। কাজেই, একটু ভয় তো ছিলই, নানারকম ভাবনাও আসছিল তার মনে।

Who was the man?
Chambal wondered what his name was.
Is he still alive?
Chambal hadn't asked anybody if the poor fellow had died at once.
Or, was it a boy, like himself?
Chambal wondered how old he was.
Then he remembered some people saying it was a boy.
How badly injured was he?
Chambal wished he knew whether it was really the boy's fault.

তার নিজের কথা মনে হল।

Do I ride too fast?
He asked himself whether he shouldn't be more careful.
Should I not pay more attention to what Mummy says?
Of course I'm a good cyclist.
He wished to know if the boy was a good cyclist, too.
Perhaps he was.
Perhaps he was careless for a moment.
Perhaps he was in a hurry.
I'm often in a hurry myself.
What will Mummy say when I tell her about the accident?
She'll say, "Do you know who the boy was?"
She'll say, "Did you ask about his name?"
She'll want to know if the boy belonged to our neighbourhood.



কিন্তু বাড়ি ফিরে চম্বল দেখল মায়ের বেশির ভাগ প্রশ্ন তাকে নিয়ে।

After a few enquiries about the accident, Mother said, "And what about yourself? I hope you remember what I told you about riding too fast?"

She wanted to know whether Chambal remembered her warning. Chambal said he did. "What do you think, Mummy?" he added, "Am I a fool? They taught us the rules of the road at school."

Mother enquired what he had been taught. "What have you been taught about crossing the street?" She asked.

রাস্তা পেরোবার নিয়ম-কানুন তোমরা জানো তো? না জেনে থাকলে বড়দের কাছে ভাল করে জেনে নিও। এদিকে আমরা ইংরেজিতে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ব্যাপারটা আরেকটু জেনে নিই।

What's your name?
May I know your name?

বুঝতেই পারছ ওপরের দুটো একই প্রশ্ন। আবার দেখ :

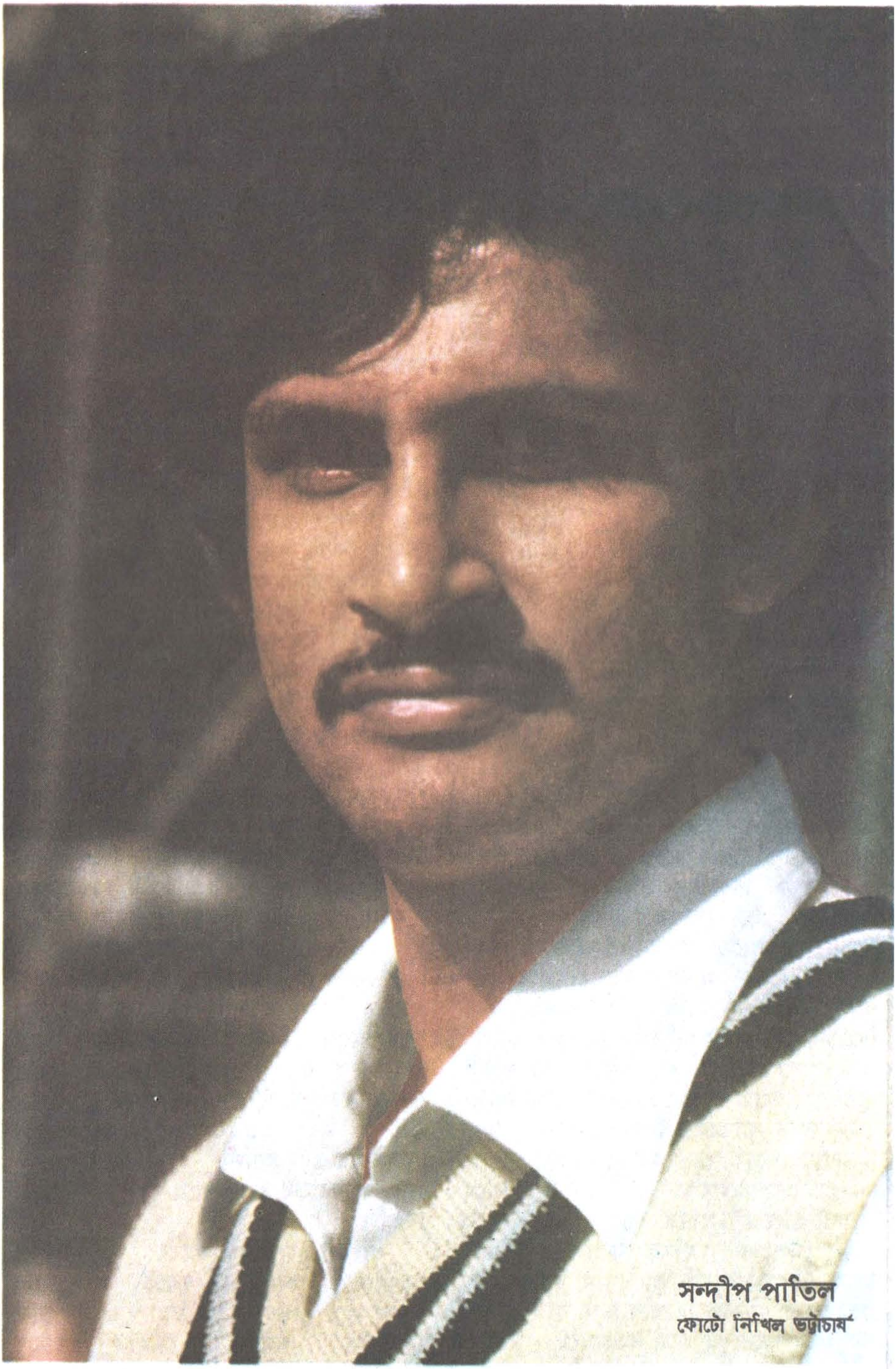
Chambal asked, "Is he badly injured?"
Chambal wondered if he was badly injured.

এ দুটোও তাই, যদিও দ্বিতীয় প্রশ্নটা ঠিক প্রশ্নের আকারে নেই। তেমনি আবার :—

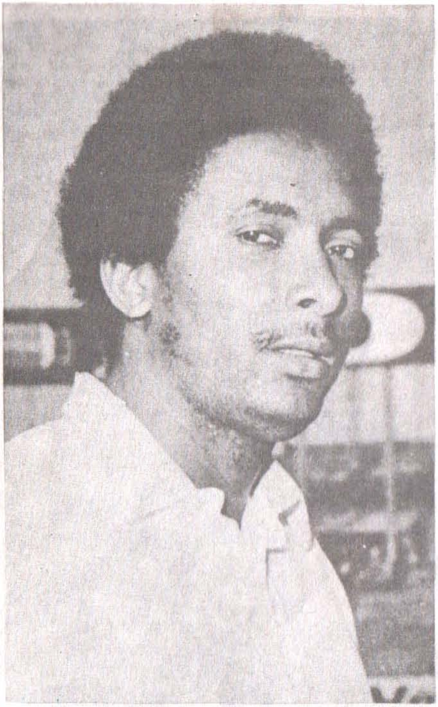
Mother asked, "What have you been taught?"
Mother enquired what he had been taught.



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



সন্দীপ পাতিল
ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য



ভারতের পক্ষে ভাল

অলোক দাশগুপ্ত

অনেক টালবাহানার পর ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর বাতিল হয়ে গেল। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট বোর্ড স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দুই দেশের কয়েকজন নামী খেলোয়াড় খেলতে পারবেন না বলে দর্শকদের কাছে সিরিজের আকর্ষণ কমে গেছে অনেকখানি। অতএব, আর্থিক লোকসানের কথা বিবেচনা করে সফর বাতিল করা হল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোর্ড বিবেচকের কাজই করেছেন। তাঁরা চেয়েছিলেন, দুই দেশ যৌথভাবে সফর বাতিলের সিদ্ধান্ত নিক। কিন্তু ভারতীয় বোর্ড পুরো দায়িত্ব ওঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতীয় বোর্ড কেন যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে এত আগ্রহী ছিলেন বোঝা গেল না। হয়তো কয়েকজন নামী খেলোয়াড় সফরে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় বোর্ড এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

তবে অনেকেই মনে করেন যে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর বাতিল হয়ে যাওয়ায় ভারতীয় ক্রিকেটের মঙ্গল হয়েছে। গত ১৭ মাসে ভারত ২৫টি টেস্ট খেলেছে—কয়েকটি পাকিস্তানে কয়েকটি ইংল্যাণ্ডে এবং বেশির ভাগ ভারতের বিভিন্ন স্থানে। খেলোয়াড়দের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে অনবরত ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, এমন-কী অনেক সময় দুটি টেস্টের মাঝে. বিশ্রামের সুযোগও হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় দলের অধিকাংশ খেলোয়াড় এখন শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে ক্লান্ত। এই সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজে গেলে অনেকে হয়তো তেমন সুবিধে করতে পারতেন না।

এই কথা বিবেচনা করেই বেশ কিছুদিন আগে সুনীল গাভাসকার দলের নেতৃত্ব ছেড়ে দেন এবং ঘোষণা করেন যে, তিনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে যাচ্ছেন না। এই ব্যাপারে অনেক জল ঘোলা হয়েছে, কিন্তু গাভাসকারের বক্তব্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিনি বলেছেন, "গত দেড় বছরে আমাকে এত বেশি ক্রিকেট খেলতে হয়েছে যে, আমি এখন অত্যন্ত ক্লান্ত। ব্যাটিংয়ে ঠিকমতো মনঃসংযোগ করতে পারছি না। অতএব আমি মনে করি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে আমার যাওয়া উচিত হবে না।"

গাভাসকার শুধু ভারতের সেরা ব্যাটসম্যান নন, একজন সফল অধিনায়কও। পাকিস্তান-অধিনায়ক আসিফ ইকবাল কবুল করেছেন, "সুনীল ভারতকে একটি লড়িয়ে দলে পরিণত করেছেন। দলের সব খেলোয়াড় তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। ভারতের সাম্প্রতিক সাফল্যে তাঁর বড় ভূমিকা রয়েছে।"

গাভাসকার ছাড়া কপিলদেবও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি হাঁটুর ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। এখন তাঁর বিশ্রামের দরকার। দেড় বছর আগে কপিলকে ক্রিকেট-জগৎ চিনত না। কিন্তু এখন পৃথিবীর অন্যতম সেরা অল-রাউণ্ডার এবং টেস্ট 'ডাবলের' (১০০টি উইকেট এবং ১০০০ রান) অধিকারী। গাভাসকার এবং আসিফ মনে করেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রাবার জয়ে কপিলের ভূমিকা বিরাট।

কপিল এবং গাভাসকারের অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে ভারতীয় দলকে অনেকখানি দুর্বল করে তুলত। শুধু এঁরা দুজনই নন, কিরমানি, ঘাউড়ি, চৌহান প্রমুখ

খেলোয়াড়রাও এই সফরে অনিচ্ছুক ছিলেন। কেউ চাপে পড়ে, কেউ আনুষঙ্গিক কথা বিবেচনা করে মত দিয়েছিলেন।

ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গেলে রবার্টস, হোল্ডিং, গারনার, ক্রফট প্রমুখের ফাস্ট বোলিং এবং লয়েড, রিচার্ডস, গ্রিনিজ কালীচরণ প্রমুখের চোস্ত ব্যাটিংয়ের বিরুদ্ধে সুবিধে করতে পারত বলে মনে হয় না।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রাবার জয় এবং ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দারুণ লড়াই ভারতীয় ক্রিকেটকে বিশ্ব-ক্রিকেটে এখন এক সম্মানজনক স্থানে পোঁছে দিয়েছে। ভারতীয় দলের মনোবল এবং দলগত সংহতি এখন শীর্ষস্থানে। এইসময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের হাতে 'মার' খেলে সেই মনোবল এবং সংহতি অনেকটাই নষ্ট হত। তবে এই সফর হয়তো সন্দীপ পাতিল, রজার বিনি, শিবলাল যাদব প্রমুখ নবাগতদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে অনেকটা কাজে লাগত। বিশেষ করে সন্দীপের কথাই আমার মনে পড়ছে। সম্প্রতি তিনি যে-ধরনের খেলা দেখিয়েছেন তাতে মনে হয়, ভবিষ্যতে তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা আরও বাড়বে। (সন্দীপের বহুবর্ণ আলোকচিত্র ৪৯ পৃষ্ঠায় দ্যাখো।)

এই বিদেশ-সফরের অভিজ্ঞতা অবশ্য সন্দীপের পক্ষেও সর্বাংশে মধুর হত কি না বলা যায় না। সন্দীপ কলকাতায় তাঁর মারের বহর দেখিয়েছেন। বিনি ভারতীয় দলের একজন প্রয়োজনীয় ক্রিকেটার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দুজনেরই বয়স কম। সেই কারণেই ভারতীয় ক্রিকেট তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে সাফল্য তাঁদের মনোবলকে যেমন বাড়িয়ে দিতে পারত, ব্যর্থতা তেমনি বড় ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নকে নষ্ট করে দিতে পারত।

সন্দীপ, বিনি, যাদবের সামনে অনেক সময় পড়ে আছে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। এখন আমরা এই বলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারি যে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ড আমাদের একটি সম্ভাব্য পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কিছু খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইও থামিয়ে দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটকে রক্ষা করেছেন।



ফোটো সন্তোষ ঘোষ

বোলিংয়ের মুহূর্তে কপিল



প্রদীপ জ্বলছে

বজ্রসেন

অনেকেই বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু এটা ঘটনা যে, ১৯৫৪ সালে কলকাতার প্রথম ডিভিশন লীগের প্রথম সাক্ষাৎকারে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এরিয়ানের কাছে ০—৪ গোলে হেরে গিয়েছিল। আর ঐ এক গণ্ডা গোলের একটি এসেছিল আঠারো বছরের একটি যুবকের পা থেকে। আগের বছরই যুবকটি সন্তোষ ট্রফিতে বিহারের হয়ে খেলেছিলেন। শুধু তাই নয়, শক্তিশালী বাংলা দলকে নাজেহাল করে সকলের নজরে পড়েছিলেন। সকলেই বুঝেছিলেন যে, এর মধ্যে 'জিনিস' আছে।

শোনা যায়, মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষই প্রবাসী বাঙালি যুবকটিকে বাংলায় আনেন। কিন্তু মোহনবাগানের নব্বই বছরের ইতিহাসের মধ্যে যে ক'টি ভুল সিদ্ধান্তের জন্যে ঐ ক্লাবের কর্মকর্তারা তথা সদস্য-সমর্থকরা আজও অনুশোচনা করে থাকেন তার একটি হল ঐ যুবকটিকে নিয়ে। একদা দুর্ধর্ষ ফরোয়ার্ড বেঙ্কটেশকে পেয়ে মোহনবাগান ক্লাব যুবকটিকে আর চিনতেই পারল না! ক্ষোভে, অভিমানে, হতাশায় যুবকটি চলে গেলেন এরিয়ানে। তাঁর এত সাধের মোহনবাগান কি না এইরকম ব্যবহার করল! মনে মনে সেদিন শপথ নিয়েছিলেন যুবকটি যে "বড়" ক্লাবের জার্সি না পরেই তিনি বড় হবেন, একদিন তাঁরই জন্যে ছোটাছুটি করতে হবে মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলকে।

যুবকটি তাঁর অঙ্গীকার পালন করেছেন। মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের জার্সি না পরেও তিনি হয়েছেন ভারত-বিখ্যাত। ১৯৫৬ সালে অবশ্য মোহনবাগানের সঙ্গে দূরপ্রাচ্য সফরে গিয়ে কয়েকটি ম্যাচ খেলে তিনি মোহনবাগানে খেলার অপূর্ণ বাসনাকে কিছুটা তৃপ্ত করেছিলেন।

মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল দু'দলই তাঁকে পেতে চেয়েছে। কিন্তু পায়নি। আবার পেয়েছেও। খেলোয়াড় হিসেবে না পেলেও কোচ হিসেবে পেয়েছে। আর যখনই এই দুই দলের একটির কোচ হয়েছেন তখনই যত পারা যায় ট্রফি সেই ক্লাবের ঘরে তুলে অপরটির দুঃখের কারণ হয়েছেন। এই লেখার সময় পর্যন্ত তাঁর মতিগতি নিয়ে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সভ্য-সমর্থকদের মধ্যে জোর জল্পনা-কল্পনা চলছে—তিনি মোহনবাগানেই থাকবেন না ইস্টবেঙ্গলে ফিরে যাবেন!

এই লেখা প্রকাশিত হবার আগেই হয়ত সে-প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বাঁকুড়ার দেশড়া গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের সন্তান ভম্বু ওরফে প্রদীপকুমার ওরফে পি কে-র সম্পর্কে আরও দু' চার কথা শুনতে পারি।

কলকাতায় একবছর খেলেই ভারতীয় দলে জায়গা করে নেন প্রদীপ—ঢাকায় কোয়াড্রাঙ্গুলার প্রতিযোগিতায়—সেবার ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কোয়াড্রাঙ্গুলারে।

এরিয়ানের পর পি কে যান ইস্টার্ন রেলওয়েতে। চাকরি নিয়ে। এখন তিনি সেখানে দায়িত্বপূর্ণ পদে আছেন। তবুও ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব রেলের সদর দফতরে

তাঁর অফিস-ঘরে ক্রীড়াজগতের সর্বস্তরের ব্যক্তির নিত্য-নিমন্ত্রণ। ১৯৫৮ সালে ইস্টার্ন রেলওয়ের যে দলটি দাপটের সঙ্গে খেলে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-মহামেডানকে অবাক করে দিয়ে লীগ নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই দলের অন্যতম সৈনিক ছিলেন পি কে। আবার ১৯৬৫-র লীগের ফিরতি খেলায় পরাক্রান্ত ইস্টবেঙ্গলকে যাঁর গোলে পরাজয় মানতে হল তিনিও ওই 'পি কে'—একশ দু ডিগ্রি জ্বর নিয়েও মাঠে নেমেছিলেন তিনি।

"কে বেশি সফল— খেলোয়াড় পি কে না প্রশিক্ষক পি কে?" এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুবই শক্ত। দুই ভূমিকাতেই প্রদীপ উজ্জ্বল। এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ভারতের ফুটবল-অধিনায়ক হয়েছিলেন ভারতের সর্বকালের সেরা রাইট-আউটদের অন্যতম পি কে। একজন ভারতীয় ফুটবলারের পক্ষে যেটা সর্বোচ্চ সম্মান। ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে প্রথম অর্জুন পুরস্কারও পেয়েছিলেন তিনিই। আবার কোচ হিসেবে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দু' দলকেই তিনি অনেক দিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গলের পর-পর ছবছর লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার মূলে তাঁর অবদান যতটা, ভারতীয় ফুটবলের ত্রিমুকুটের একমাত্র বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে তিনি মোহনবাগানকে সাহায্য করেছেন ততখানিই। এই দুই ক্লাবকে আরও অনেক সাফল্যই তিনি এনে দিয়েছেন।

পি কে ভারতীয় ফুটবল-জগতে এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর সব কাজ আমি নিজেও সমর্থন করি না। সুযোগ পেলেই দিলীপ পালিতের ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করব। তবে তাঁকে যতটা দেখেছি, তা থেকে তাঁর দু'টি বৈশিষ্ট্য ধরে ফেলেছি সহজেই। তিনি স্পষ্টবক্তা। আর, ভয়ংকর দুঃসাহসী। বিরুদ্ধ দলের বিপজ্জনক সমর্থকদের মুখোমুখি হতে তাঁর এতটুকু দ্বিধা বা ভয় নেই! পরিবেশ প্রতিকূল জেনেও তিনি তাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা বা তর্কে পিছপা হন না।

দোষেগুণে মানুষ। কাজেই পি কে-র নানা ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত থাকতে পারে, কিন্তু ফুটবলার পি কে-কে নিয়ে কারও কোনো দ্বিমত নেই। প্রদীপ জ্বলছে, জ্বলবে।—

ইডেনে তীরন্দাজি

চিরঞ্জীব

রাইফেল, পিস্তল, বন্দুকের মতো তীর ছোঁড়াও এখন অলিম্পিক গেমসের অন্যতম ইভেন্ট। তবে এখনকার ধনুক আর তীর কিন্তু রামায়ণ, মহাভারতের যুগের মতো নয়। আমাদের মফস্বলে সাঁওতালরা যে বাঁশের ধনুক এবং বেতের কিংবা ওই ধরনের তীর ব্যবহার করেন শিকারে বা লড়াইয়ে—তা কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দেখা যায় না।

কলকাতায় পাক-ভারত ক্রিকেট টেস্টের পরের সপ্তাহে ইডেনে এসেছিলেন এশিয়ার সব নামজাদা তীরন্দাজরা। অবাক হয়ে দেখার মতো ওঁদের সব ধনুক আর তীর। গাভাসকর তাঁর ব্যাটেরও বোধহয় অমন যত্ন করেন না; মানস-বিদেশ-সুরজিৎরা ফুটবলকে এমন পুজো করেন না।

কলকাতায় প্রথম এশিয়ান কাপ তীরন্দাজি প্রতিযোগিতায় পুরুষদের চ্যাম্পিয়ন ইন্দোনেশিয়ার ডোনাল্ড পান্ডিয়ানগানের ধনুকের লম্বা বাক্সটি দেখছিলাম। তার আগে শেষ দিনে টার্গেটে শেষ তীরটি ছোঁড়ার আগে ৯০ মিটার দূরে রাখা গোল টার্গেটটি দেখে নিলেন তিনি টেলি-লেন্সে। এরপর গ্রাফাইট ফাইবারের তীরটি ছুঁড়লেন। 'খট' শব্দে একেবারে টার্গেটের কেন্দ্র-বিন্দুতে লাগল। ডোনাল্ড কাঁধ থেকে ধনুকটি নামিয়ে একটু দেখে ফিরে এলেন। এবার ধনুকটি আস্তে আস্তে খুলে ফেললেন। স্ক্রু খুলে অত বড় ধনুকটিকে দু' ফুট জায়গার মধ্যে রাখলেন। মোজা পরানোর মতো দামি উলেন কভারে ঢাকলেন। খোপ-খোপ-করা বাক্সের মধ্যে সাজালেন। বাক্সের উপরের ঢাকনায় তূণ রাখার পৃথক জায়গা। তাও আবার একটির গায়ে আরেকটি যাতে না লাগে—এমন ব্যবস্থা।

এই প্রতিযোগিতায় চীনের সেরা মেয়ে ফান-আই মেং-এর কাছে শুনলাম, সব প্রতিযোগীই আমেরিকায় তৈরি 'ইস্টন' ধনুক ব্যবহার করেন। ভারতীয় মুদ্রায় একটি ধনুক আর দুই ডজন তীরের দাম পড়ে দু' হাজার টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সরঞ্জাম চাই। তার দাম



ডোনাল্ড



বারোশো টাকা। চীন, জাপান ও ইন্দোনেশিয়ার প্রত্যেককে দেখছিলাম, তীর ছোঁড়ার আগে টেলি-লেন্সে টার্গেটটি নিরিখ করছেন। ওই লেন্সের দাম কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার কম নয়। ধনুক রাখার জন্য চাই স্টেবিলাইজার।

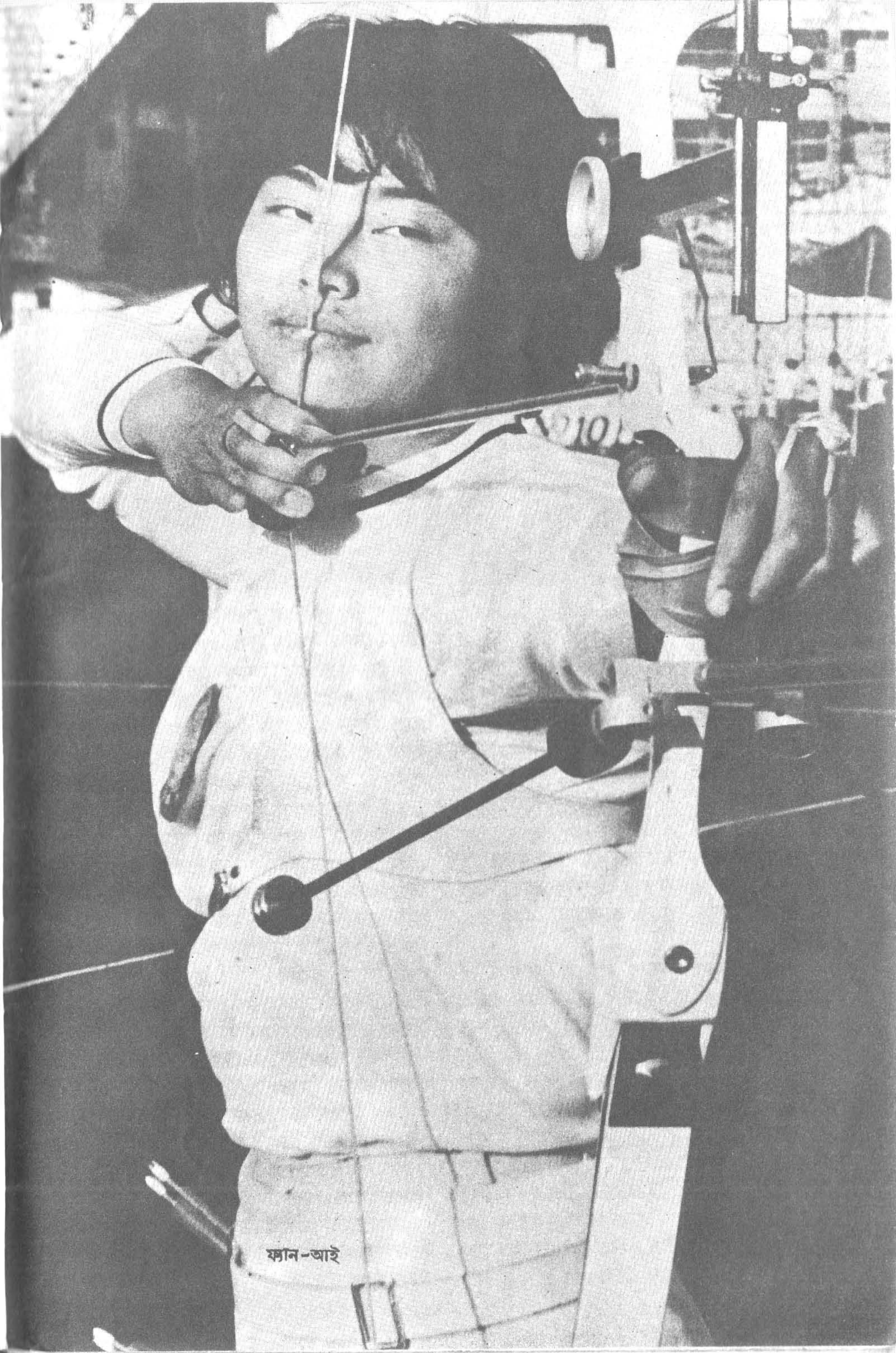
"এত সব জিনিস আর আধুনিক ধনুক ও তীর আমাদের দেশে খুব কম মানুষেরই আছে," বললেন ভারতের সেরা তীরন্দাজ হাওড়ার চন্দ্রকুমার দাস। এছাড়াও চাই আলাদা ধরনের পোশাক, জুতো।

ইডেনে দুদিন ধরে মোহনবাগান মাঠের দিকে মেয়েরা আর আকাশবাণীর দিকে পুরুষ তীরন্দাজরা ফুটবল, ক্রিকেটের মতো আনন্দ দিতে পারেননি, কিন্তু অনেককে আকৃষ্ট করেছেন। ইডেনের সবুজ গালিচার উপর ওঁদের লক্ষ্যভেদের অভিজ্ঞতা নতুন। ডোনাল্ড জানালেন, তিনি ব্যাংকক এশিয়ান গেমস, বার্লিনে বিশ্ব-তীরন্দাজি বা গত বছর মস্কোর স্পার্টাকিয়াডেও কলকাতার মতো এত দর্শক দেখেননি। ওঁর দুঃখ, "এদেশে এত দর্শক তবুও তেমন ভাল তীরন্দাজ নেই। শয়ে শয়ে ছেলেমেয়ে এই খেলায় অংশ নেয় না।"

চীনে এখন রেজিস্টার্ড তীরন্দাজের সংখ্যা পাঁচ হাজারের উপর। জাপানে দশ হাজার, ইন্দোনেশিয়ায় তিন হাজার। আমাদের ভারতে কিন্তু পাঁচশোও নেই। জাপানের মাৎসুসিকা বললেন, ওঁদের দেশে অসংখ্য প্রতিযোগিতা হয় প্রতি বছর। প্রতিদ্বন্দ্বিতাও এমন যে, কে কখন সেরা হবে বলা মুশকিল।

তবে চীন যেভাবে এগিয়ে আসছে, কয়েক বছরের মধ্যে হয়তো তারা সকলকে ছাড়িয়ে যাবে। শারীর-শিক্ষার ছাত্রী ২৫ বছর বয়সি ফান-আই মেং-এর কাছে শুনলাম, ওঁদের স্কুলে তীরন্দাজি শেখাবার ব্যবস্থা করেছেন সরকার। ছাত্রছাত্রীরা খুব আগ্রহ নিয়েই নিয়মিত তীর ছোঁড়ে। আর আমাদের ভারতে? অনেকে একে শিক্ষিতদের খেলা বলতেই রাজি নন।

ফোটো অলক মিত্র


ফ্যান-আই



বাদুড়

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

রাত-দুপুরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কোথা থেকে একটা বাদুড় ঘরে ঢুকে পড়েছে। তার ডানার ঝটপটানিতে মশারিটা দুলে-দুলে উঠছে।

হ্যারিকেনটা নিবে গেছে। হাতের কাছে টর্চ হাতড়ালাম। কিন্তু কোথায় রেখেছি মনে করতে পারছি না। তাড়াতাড়ি ডাকলাম, "সমরেশ, সমরেশ।"

পাশের বিছানায় শুয়ে সমরেশ। এক ডাকে তার ঘুম ভেঙে গেল। ডানার ঝটপটানি শুনে ঘুম-চোখে ভয় পেয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, "কী ব্যাপার? ও কী?"

আমি বললাম, "একটা বাদুড় ঢুকে পড়েছে। তোমার কাছে টর্চ আছে—টর্চ?"

সমরেশ তাড়াতাড়ি মশারির ভেতর থেকে টর্চ জ্বালল। অন্ধকার ফুঁড়ে টর্চের এক ঝলক আলো গিয়ে পড়ল সিলিংয়ের দিকে। সেই আলোয় দেখলাম একটা বীভৎস চেহারার কালো বাদুড় বৃত্তাকারে ঘুরছে। টর্চের আলোয় তার চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল।

আমি সমরেশকে বললাম, "আলোটা ওর চোখে ফেল। আমি দেখছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম আমি। দেওয়ালের এক কোণে একটা লাঠি কাল রাতে নিজেই রেখে দিয়েছিলাম। সেই লাঠি দিয়ে প্রাণপণে খোঁচা মারবার চেষ্টা করতে লাগলাম বাদুড়টাকে। কিন্তু কিছুতেই তাকে ছুঁতে পারলাম না। বরং একবার পাক খেয়ে ঘুরতে-ঘুরতে ঠিক আমার মুখের কাছে নেমে এল। মনে হল আমার মুখে ডানার ঝাপটা মারাই ছিল তার উদ্দেশ্য। কিন্তু একটুর জন্য লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়ে আবার উঠে গেল।

প্রায় পাঁচ মিনিট বাদুড়টার সঙ্গে যুদ্ধ করে যখন ক্লান্ত, তখন দেখি খোলা দরজা দিয়ে রিচার্ড ঘরে ঢুকছে। রিচার্ড যে এতক্ষণ তার বিছানায় ছিল না, এ-খেয়াল আমার হয়নি।

"কী ব্যাপার চ্যাটার্জি? কী হয়েছে? বলতে-বলতে রিচার্ড ঢুকল।

আমি তাকে বললাম, "এ ব্যাট। বাদুড়। এই বাদুড়টাকে কিছুতেই তাড়াতে পারছি না।"

"মাই গুডনেস!" অস্ফুট আর্তনাদ করে রিচার্ড তার বিছানায় বসে পড়ল।

বাদুড়টা একবার রিচার্ডের দিকে তাক করে এগিয়ে এল, কিন্তু রিচার্ড তার বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিতেই মুহূর্তের মধ্যে বাদুড়টা পিছনে

হঠাৎ দু পাক ঘুরে সমরেশের মুখে ডানার এক ঝাপট মেরে খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

মুখটা চেপে ধরে বসে রইল সমরেশ। তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি ওর মুখের একটা জায়গা ছড়ে গেছে। সেখানে ফুটে উঠেছে ফোঁটাফোঁটা রক্ত।

সমরেশকে ফার্স্ট এইড দিয়ে সারা রাত আলো জ্বালিয়ে বসে রইলাম। কিন্তু দেখে মনে হল, সমরেশের চেয়ে আরও বেশি ভয় পেয়েছে রিচার্ড। সে বারবার বলছে, "আমি জানতাম সে আসবে, সে আসবে।"

"কে?"

"এই বাদুড়টা। মিঃ চ্যাটার্জি, আপনি উইচক্র্যাফ্‌টে বিশ্বাস করেন?"

আমি বললাম, "একদম না।"

রিচার্ড বলল, "আমিও করতাম না। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে করছি। এই মন্ত্রপূত তাবিজটা না থাকলে ওই বাদুড়টার হাত থেকে আজ রাতে আমার নিষ্কৃতি ছিল না।"

"মন্ত্রপূত তাবিজ?"

"হ্যাঁ, তুমি জানো, আমি বটানিস্ট। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে দুষ্প্রাপ্য অর্কিডের সন্ধানে আমি সুদূর আমেরিকা থেকে এই পালামৌয়ের জঙ্গলে এসেছি। কিন্তু এখানে এসে প্রথম কদিন শুধু ঘোরাঘুরিই সার হয়েছিল। কোনো নতুন জাতের অর্কিডও আবিষ্কার করতে পারিনি। তার ওপর শরীরটা অত্যন্ত অবসন্ন মনে হচ্ছিল। ভাবলাম দেশে ফিরে যাব। কিন্তু মনে-মনে দুশ্চিন্তা ছিল। আমার ইউনিভার্সিটি আমাকে এখানে আসবার খরচ জুগিয়েছে, তাদের কাছে কৈফিয়ত দেব কী? ঠিক এমন সময় পরশুদিন জঙ্গলের ভেতর এক আদিবাসীর দেখা পেলাম। লোকটা যুদ্ধের সময় পল্টনে ছিল। মোটামুটি ইংরেজি জানে। আমাকে বলল, সাহেব, তোমাকে আমি এক অত্যন্ত দামি জিনিস দিতে পারি যদি তোমার বিশ্বাস থাকে। আমি বললাম, কী? সে বলল, বাদুড় জানো? ব্যাট? সেই বাদুড়ের হৃৎপিণ্ড দিয়ে তৈরি এক তাবিজ তোমাকে দিতে পারি। অমাবস্যার রাতে কালো বাদুড়কে ধরে ছাইয়ের উপর রেখে হৃৎপিণ্ডটা বার করে নিতে হয় যাতে এক ফোঁটা রক্তও না মাটিতে পড়ে। তারপর সেই হৃৎপিণ্ড তাবিজের মধ্যে পুরে সেই তাবিজ কালো সুতো দিয়ে গলায় পরলে সমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

"আমি বিজ্ঞানী, আমার পক্ষে এ-সব বিশ্বাস না করাই উচিত। কিন্তু উইচক্র্যাফটে আমার আগ্রহ ছিল। আমি অনেক উইচক্র্যাফটের বইতে পড়েছি ইউরোপের কয়েকটি অঞ্চলে এই ধরনের বিশ্বাস আছে। কিন্তু ইন্ডিয়ার ট্রাইবদের মধ্যেও সেই একই বিশ্বাস? আমার খুব আগ্রহ হল। আমি রাজি হলাম। লোকটি এক হাজার টাকা দাবি করল। তাতেও গররাজি হলাম না। তারপর গতকাল আমায় তাবিজটা দিয়ে গিয়ে সে বলল, পরশু রাতে ছিল অমাবস্যা। সেই রাতে সে তাবিজটা তৈরি করেছে। 'তবে সাবধান সাহেব, তাবিজটা যেন হাতছাড়া না হয়। কারণ যে বাদুড়টিকে আমি মেরেছি, তার একটা জোড়া ছিল। সে হয়তো তোমার খোঁজ করতে পারে।' সেই কথা শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল।

"কিন্তু তোমাদের কী বলব, তাবিজটা পরবার পর আমার দেহে-মনে যেন নতুন করে এনার্জি ফিরে পেলাম। আর গতকাল বিকেলেই দু-দুটো নতুন অর্কিড খুঁজে পেয়েছি। অমঙ্গলের আশঙ্কা মন থেকে দূর হয়ে গিয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলাম। রাত্তিরে ঘুমও হচ্ছিল ভাল। শুধু বাথরুমে যাবার জন্য উঠেছিলাম, তার মধ্যেই এই বিপত্তি। আমার এখন মনে হচ্ছে, ওই বাদুড়টা সেই নিহত বাদুড়ের সঙ্গী। কাল রাতে সে আমার খোঁজেই এসেছিল।"

নানান আশঙ্কা সত্ত্বেও শেষ রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এই আমঝোরিয়া ডাক-বাংলোয় তিনদিনের জন্য এসে এ কী বিপত্তিতে পড়লাম। আমরা এসেছি আমাদের কাগজে এখানকার অরণ্য সম্পর্কে এক ফীচার লেখার তথ্য সংগ্রহ করতে। সমরেশ আমাদের ফোটোগ্রাফার। আগামী কাল বিকেলেই আমরা চলে যাব। এই নির্জন ডাকবাংলোয় এখন আমরা তিনটি মাত্র প্রাণী। আমি, সমরেশ ও রিচার্ড। রিচার্ড অবশ্য আমাদের আগেই এখানে এসেছে। বছর চল্লিশেক বয়স। খুব আলাপী। এই কদিনে ওর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

কেন জানি না, পরদিন আমার ঘুম ভাঙল



পায়ের জোরেই

মনোজিৎ বসু

এক জোড়া পা আছে বলেই
ফুটবলটা খেলতে পারো,
বন্ধ-হওয়া মোটরগাড়ি
পেছন থেকে ঠেলতে পারো ;
পা আছে তাই প্যাডেল করে
সাইকেলেতে ছুটতে পারো,
গাছের ডালে তড়বড়িয়ে
দিব্যি কেমন উঠতে পারো ;
পা আছে তাই লাইন দিয়ে
ট্রেনের টিকিট কাটতে পারো,
ট্রাম-বাসটা ফসকে গেলেও
অনায়াসেই হাঁটতে পারো ;
পা আছে তাই ঘুঙুর-পায়ে
কতই নাচন নাচতে পারো,
আসল কথা—পায়ের জোরেই
পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে পারো !!

ছবি দেবাশিস দেব

দৌড়তে। সমরেশ আগেই উঠেছে। রিচার্ড নেই। সে নিত্যদিনের মতো ভোরবেলা উঠে জঙ্গলে চলে যায়। ফেরে লাঞ্চের সময়। আমাদের জীপ আসে বেলা আটটা নাগাদ। আমরা জঙ্গলে ঘুরতে যাই। আজও আটটায় জীপ এল। জীপে উঠে সমরেশ পকেট থেকে একটা তাবিজ বার করে দেখাল। "এই দ্যাখো, রিচার্ডের সেই মন্ত্রপূত তাবিজ।"

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, "এ তুমি কোথায় পেলে?"

সমরেশ বলল, "রিচার্ড যখন ঘুমোচ্ছিল তখন চুপিচুপি কেটে খুলে নিয়েছি। কাল আমাদের যে আষাঢ়ে গল্প শুনিয়েছে, তার শাস্তি।"

আমি বললাম, "ছি ছি, এ তুমি অন্যায় করেছ সমরেশ।"

"দেখাই যাক না, সত্যিই কতখানি মন্ত্রপূত এই তাবিজ। চ্যাটার্জি, তুমিও এই সব বুজরুকিতে বিশ্বাস করো? জঙ্গলের মধ্যে জানালা খোলা পেয়ে একটা বাদুড় কাল রাতে আমাদের ঘরে ঢুকেছিল, এতে আশ্চর্যের কী আছে। এ তো অতি স্বাভাবিক ঘটনা। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে ভয় দেখানোর এইভাবেই প্রতিশোধ নিয়ে দেখা যাক না।"

কিন্তু আমার যেন সারাক্ষণই মনে হচ্ছিল, এ একটা গুরুতর অন্যায় হল। মনে হচ্ছিল আরও কী বিপদ যেন আমঝোরিয়ার জঙ্গলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

আমার আশঙ্কা যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ পেলাম দুপুর বেলা বাংলোয় ফিরে।

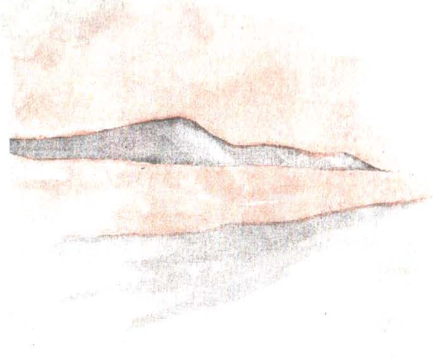
দেখি, বাংলোর সামনে স্থানীয় লোকজনের ভিড়। আমাদের দেখে চৌকিদার ছুটে এল। "বাবুজি, সর্বনাশ হয়েছে। সাহেবের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। ওই দেখুন তার মৃতদেহ নিয়ে আসা হয়েছে।"

যারা প্রথম জঙ্গলের মধ্যে রিচার্ডের মৃতদেহ আবিষ্কার করে তাদের একজন বলল, একটা পাহাড়ের ধারে পাথরের উপর রিচার্ডের প্রাণহীন দেহটা পড়ে ছিল। আর সে যখন মৃতদেহটির কাছে যায়, তখন নাকি দেখা যায় একটি বাদুড় ওর মৃতদেহের উপরে চক্কর দিয়ে উড়ছে।

ছবি মাখন দত্তগুপ্ত

মারে-ডার্লিং

দিদিমণি



অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের আয়তনের তুলনায় নদীর সংখ্যা কম, দীর্ঘতম নদীর নাম মারে। এই নদীটি প্রধান উপনদী ডার্লিং-এর সঙ্গে মিশে তৈরি করেছে মারে-ডার্লিং উপত্যকা।

মারে নদীর দৈর্ঘ্য ১,৬০৯ মাইল বা ২,৫৮৯ কিলোমিটার। অস্ট্রেলিয়ার বরফে ঢাকা পাহাড় থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়ে এই নদী ভারত মহাসাগরে পড়েছে। অববাহিকার আয়তন ৪১৪,২৫৩ বর্গ-মাইল বা ১,০৭২৯০৫ বর্গ-মিটার। কম করে তিন জায়গায় এই নদীর জল একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে। নদীটি নিউ সাউথ ওয়েলসের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে অবস্থিত কোসিয়াস্কো পাহাড়ের কাছাকাছি পাইলট পাহাড় থেকে বেরিয়েছে। প্রথমে পশ্চিম দিকে তারপরে উত্তর-পশ্চিম দিকে বয়ে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস ও ভিক্টোরিয়া রাজ্য দুটির সীমা রচনা করছে, তারপর হিউম জলাধারের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার মর্গানের কাছে পৌঁছে এই নদী দক্ষিণ দিকে একটা তীব্র বাঁক নিয়েছে এবং অ্যালেকজান্ডারিয়া হ্রদের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে ভারত মহাসাগরেরই একটি অংশ এনকাউন্টার উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। নদীটি উচ্চভাগে ২০০ মাইল পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। মধ্যভাগে অবশ্য প্রশস্ত সমতলভূমি আছে, নিউ সাউথ ওয়েলসে এই সমতলভূমির নাম রিভেরিনা এবং দক্ষিণে এই সমতলভূমিকে বলা হয় ভিক্টোরিয়া সমতলভূমি। ডার্লিং, লাচলান, মারামবিড্‌জি, মিটা মিটা, ওভেনস গোউলবার্ন, ক্যামপামপে এবং লডডন এই নদীর প্রধান উপনদী।

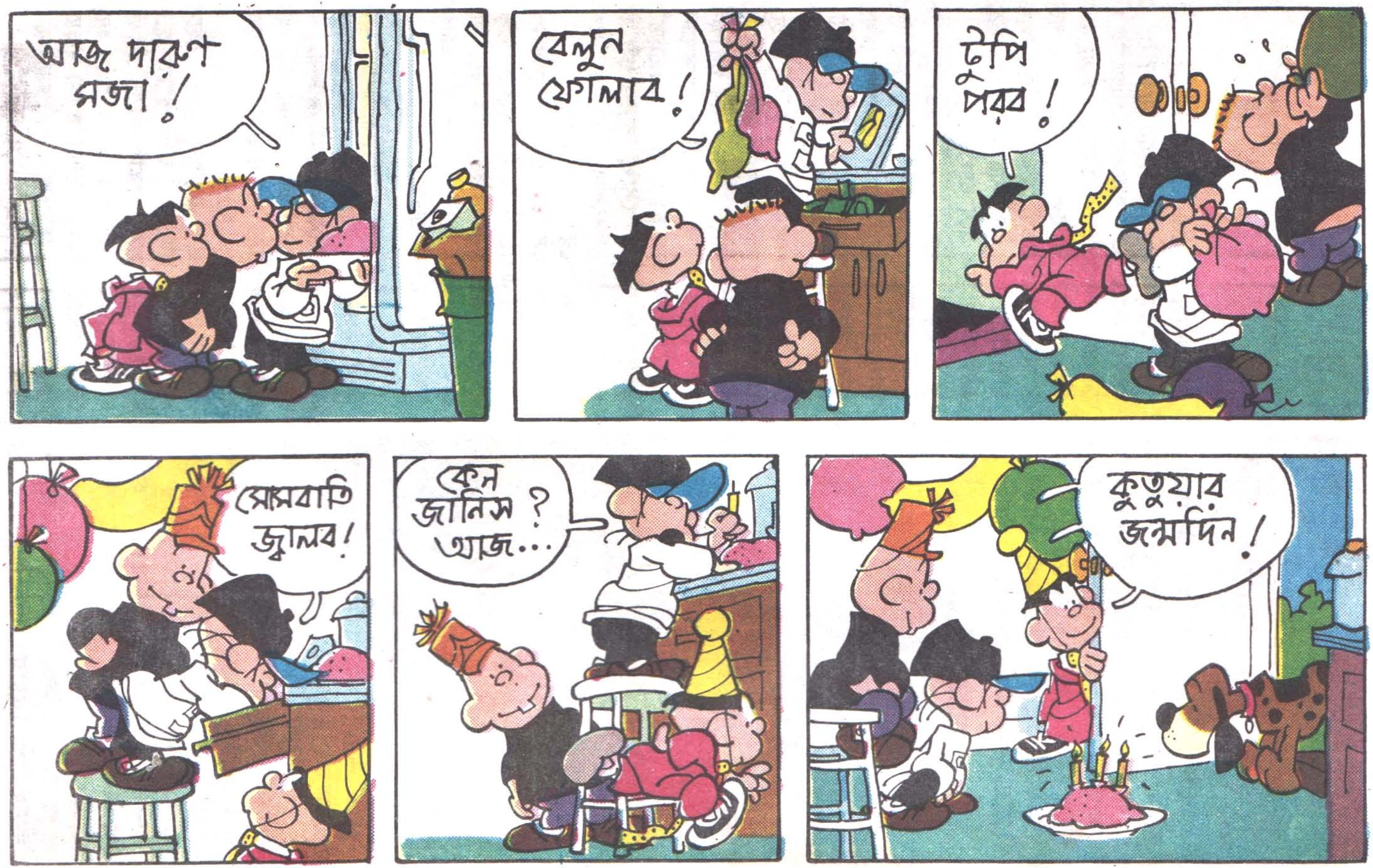
নদীর বাণিজ্যিক গুরুত্ব খুব বেশি। এই নদী অস্ট্রেলিয়ার গম-চাষ এবং পশুচারণ এলাকা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। একশো বছর আগে এই নদীপথই ছিল যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম, কিন্তু রেলপথ তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াতের জন্যে নদীপথের ব্যবহার কমে যায়। এখন এই নদীর জল জলসেচের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। এই নদীর জল অস্ট্রেলিয়ার নানাবিধ ফসল ও ফল চাষের সহায়ক। নদীতে জল সংরক্ষণের জন্য নানারকম পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। নদীর ধারে অনেকগুলি শহর আছে—তাদের মধ্যে অ্যালবারি, ইচুকা, সোয়ান হিল, মিলডুরা, রেনমার্ক এবং মারে ব্রিজ প্রধান।

মারের উপনদী ডার্লিং ১৭০২ মাইল লম্বা। মারে ও ডার্লিং নদীর মিলিত স্রোতই অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম নদীপ্রবাহ। গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে অনেকগুলি ছোট ছোট নদী মিলিত হয়ে ডার্লিং নদীর সৃষ্টি। নদীগুলি বেরিয়েছে নিউ সাউথ ওয়েলস ও কুইনসল্যান্ডের সীমানা থেকে। ডার্লিং নদী দক্ষিণ-পশ্চিমে নিউ সাউথ ওয়েলসের মধ্য দিয়ে ১,৭০০ মাইল বা ২,৭০০ কিলোমিটার বয়ে গিয়ে ওয়েন্টওয়ার্থ শহরের কাছে মারে নদীর সঙ্গে মিশেছে। ডালিং নদীর প্রধান উৎস হল সেভার্ন নদী। নীচের দিকে যে উপনদীগুলি আছে তাদের জলপ্রবাহ কোন বছর বন্যা বা কোন বছর খরার জন্যে কম-বেশি হয়। ডার্লিং নদী বেশিরভাগ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের এমন অংশের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত মাত্র ১০ ইঞ্চি বা তারও কম। সেইজন্যে দু'পাশে আছে কাঁটা - ঝোপের চারণভূমি। অনেক উপনদীর জলই ডার্লিং নদী পর্যন্ত এসে পৌঁছবার আগেই শুকিয়ে যায়। যেখানে বৃষ্টি কম সেখানে মেষপালন এবং যেখানে বৃষ্টিপাত বেশি সেখানে কৃষিকার্য করা হয়।

বাঘা


পিঙ্কি আসছে, চল আমরা লুকিয়ে থাকি।
দেখতে পায়নি!
এইখানে লুকোনো যাক!
যাক, আর দেখতে পাবে না!
পিঙ্কি চলে গেল, এবারে ...
আয় আমরা খেলি!
যাই বলিস, লুকোবার খেলাটাই কিন্তু দারুণ জমেছিল!

বাঘা



ইউনাইটেড মিশনারি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কী বলেন

১৮৩২ সালে নাম ছিল দি ক্রিশ্চিয়ান গার্লস হাই স্কুল, ভবানীপুর। কলকাতার আশুতোষ মুখার্জি রোডে এই স্কুলটি সেই থেকেই আছে। ১৯১৮ সালে নতুন বিল্ডিং তৈরি হয়। লেডি কারমাইকেল উদ্বোধন করেছিলেন এই স্কুলের। তখন থেকেই নাম হয়েছে ইউনাইটেড মিশনারি গার্লস হাই



স্কুল। তিনটি মিশন মিলিত হয়েছে বলেই স্কুলের এই নাম রাখা হয়েছে।

এই স্কুলের কোনো ছাত্রীই সাধারণত মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল করে না। গত বছর ১১৯ জন ছাত্রীর মধ্যে ষাট জন ছাত্রী প্রথম বিভাগে পাশ করেছে, ৯ জন তৃতীয় বিভাগে। অনেক ছাত্রীই প্রতি বছর লেটার, স্টার ও ন্যাশনাল স্কলারশিপ পায়। হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় অনেক মেয়ে স্ট্যাণ্ড করেছে।

প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী জাহানারা টমাসের বিষয় ইংরেজি। গত পঁচিশ বছর ধরে এই স্কুলে ইংরেজি পড়াচ্ছেন।

"উত্তর কীভাবে লিখতে হবে?" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "প্রথমেই চাই লেখার অভ্যাস। ছাত্রীদের মধ্যে একটা প্রবণতা আছে, তা হল শুধু পড়ার। পড়ার পরেই লেখা উচিত। তাহলে উত্তর লেখার হাত তৈরি হবে, পরীক্ষায় ভাল নম্বর উঠবে, এবং বানান ভুল হবে না।

"ছাত্রীরা আবার অনেক সময় মন দিয়ে প্রশ্ন পড়ে না। যা চাওয়া হচ্ছে তারই উত্তর দিতে হবে, এবং তার মধ্যে নিজস্বতা দেখাতে হবে। উত্তর ভাল লিখতে হলে সূচনা ও উপসংহার বেশ ভাল হওয়া চাই। প্রথম থেকেই পরীক্ষককে আকৃষ্ট করতে হবে। গতানুগতিকতা অর্থাৎ সবাই যা লিখছে তার থেকে একটু আলাদা উত্তর সব পরীক্ষকই চান। উত্তরে নির্ভুল এবং উপযুক্ত কোটেশান দিতে পারলে ভাল হয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা একই কথা বারবার লেখে, বানান ভুল করে—এগুলো এড়ানো দরকার। যেটুকু লিখবে যেন গুছিয়ে লেখে।

"হাতের লেখার ওপর বিশেষ নজর দিতে হবে। এছাড়া মার্জিন, প্রশ্নের নির্ভুল নম্বর, প্যারাগ্রাফ ও পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখতে হবে। প্রতিটি পয়েন্ট আলাদা প্যারাগ্রাফে লেখা উচিত।"

ইংরেজির প্রসঙ্গে শ্রীমতী টমাস জোর দিয়ে বললেন, "ইংরেজিতে মুখস্থ-বিদ্যা এড়িয়ে চলতে হবে। একটা শব্দের কত প্রতিশব্দ হতে পারে তা অভিধানে দেখতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের শব্দ-ভাণ্ডার বাড়াতে হবে।"

বাংলার সম্পর্কে বললেন, "টেক্সট বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বইও পড়তে হবে। নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে শিখতে হবে। নিজের মনোভাবকে প্রকাশ করার জন্যে রোজ লিখতে হবে। বলার ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। কারণ, মৌখিক পরীক্ষায় অনেক নম্বর আছে।"

অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে শ্রীমতী টমাস বললেন, "গোড়া থেকেই গণিতের প্রতি ভালবাসা, আগ্রহ ও উৎসাহ থাকা চাই। গণিতকে এত ভয় কেন? শৈশবেই গণিতের প্রতি একটা ভীতির সৃষ্টি হয়ে যায়। এটা ঠিক নয়। প্রচুর অনুশীলন করা দরকার। বিজ্ঞান ও অঙ্কের সম্পর্ক খুব কাছাকাছি। প্র্যাকটিক্যাল ছাড়া বিজ্ঞান পড়া যায় না। ভূগোল ও ইতিহাসে শুধু টেক্সট বইয়ের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখলে চলবে না। ম্যাপের সাহায্য নিয়ে পড়তে হবে। ইতিহাস যে মৃত বিষয় নয়, এটা বোঝার জন্যে সুযোগ পেলে নানা ঐতিহাসিক জায়গায় বেড়াতে যাওয়া দরকার।

"কর্মশিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে কাজ শিখতে হবে। শারীর-শিক্ষা খুব ভাল, এতে ছাত্রছাত্রীদের শরীরের উন্নতি হয়। কর্মশিক্ষার জন্য প্রচুর সময় দিতে হবে। বাঁধা রুটিনে কাজ করলে চলবে না। মহাপুরুষদের জন্মদিন, ২৬ জানুয়ারি ইত্যাদির অনুষ্ঠানও কর্মশিক্ষার মধ্যে পড়ে।"

আনন্দমেলা প্রসঙ্গে শ্রীমতী টমাস বললেন "এই পত্রিকাটি কিশোর-কিশোরীদের জন্যে অতি চমৎকার পত্রিকা। এই কাগজ ওরা বিশেষ উৎসাহ নিয়ে পড়ে এবং ভাল ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরে উপকৃত হয়। শিশুমনকে আকর্ষণ করার সব - কিছুই আছে এই পত্রিকায়। আমার স্কুলের অনেক ছাত্রীই এই পত্রিকার গ্রাহক।"

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল



এবারে শতকরা ৭৭ ভাগ নম্বর পেয়ে নাইন থেকে টেনে উঠেছে সোমা দে। চারটে সেকশান মিলিয়ে প্রথম হয়েছে। সোমা এগার বছর ধরে এই স্কুলে পড়ছে। সোমারা ভবানীপুরে থাকে। বয়স ১৪। বাবা সরকারি চাকুরে। সোমা বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান।

সোমা বলল, সে প্রথমে টেক্সট বই ভাল করে পড়ে, তারপর সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর লিখে স্কুলের দিদিমণিদের দেখিয়ে নেয়। স্কুল থাকলে দৈনিক ছ'ঘণ্টার বেশি পড়া হয় না। ছুটির দিনে বেশি পড়ে। পড়ার চেয়ে লেখায় সময় বেশি দেয়।

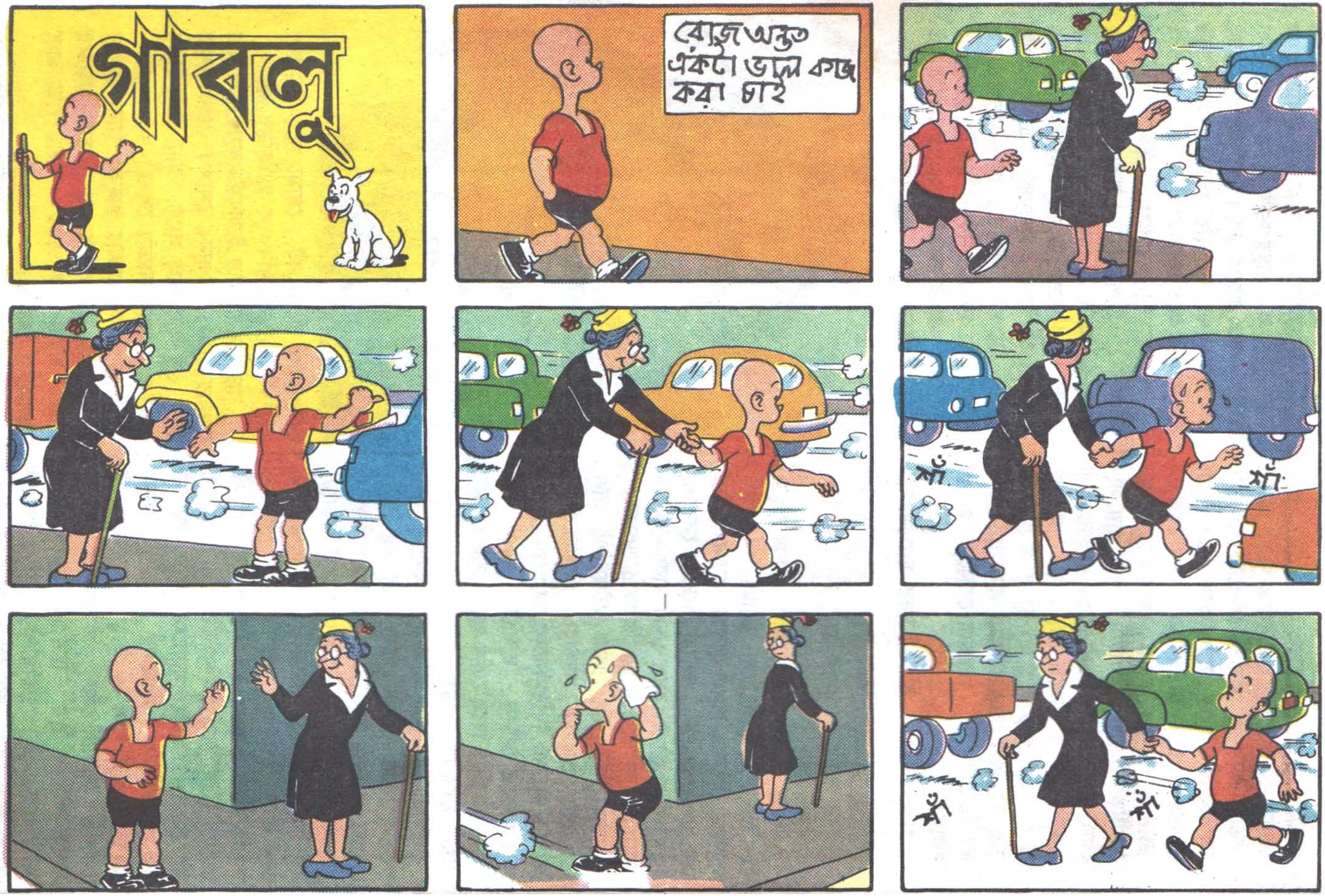
সোমাদের স্কুলে বাংলা ব্যাকরণের জন্য পড়ানো হয় জগদীশচন্দ্র ঘোষের বই। এছাড়া ও পড়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য বই। ইংরেজি গ্রামার স্কুলে পড়ানো হয় পি মাহাতো। সোমা সেই সঙ্গে পড়ে রেন অ্যান্ড মার্টিন, পি কে দে - সরকার। স্কুলে অঙ্ক কষানো হয় কেশব নাগের বই থেকে। ও বাড়িতে অঙ্ক কষে কে পি বসুর বই থেকেও। লাইফ সায়ান্সে স্কুলে পড়ানো হয় কার্তিক মণ্ডলের বই। সোমা রবীন্দ্রনারায়ণ পাল ও কুণ্ডু-দাশ-কুন্ডুর বই থেকেও সাহায্য নেয়। ফিজিক্যাল সায়ান্সে স্কুলে পড়ানো হয় চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত ও সমর গুহর বই। কেমিস্ট্রির জন্য ও পি কে দত্তর বইও পড়ে। ভূগোলে স্কুলে পড়ানো হয় উপেন্দ্রনাথ রায়ের বই, সোমা পড়ে লোকেশ চক্রবর্তীর ও তরুণবিকাশ লাহিড়ির বই।

বড় হয়ে সোমার ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার ইচ্ছে। ও গানও শেখে। শরৎচন্দ্রের লেখা ওর খুব ভাল লাগে, আর ভাল লাগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা।

সোমা আনন্দমেলার গ্রাহক। আনন্দমেলার সব-কিছুই ভাল লাগে ওর। তবে, সবচেয়ে ভাল লাগে কুন্তকের মজার পড়া এবং খেলাধুলা বিভাগ।

ফোটো দেবীপ্রসাদ সিংহ

সাধনা মুখোপাধ্যায়


গাবলু
রোজ অন্তত একটা ভাল কাজ করা চাই
সাঁ
সাঁ:
সাঁ
সাঁ

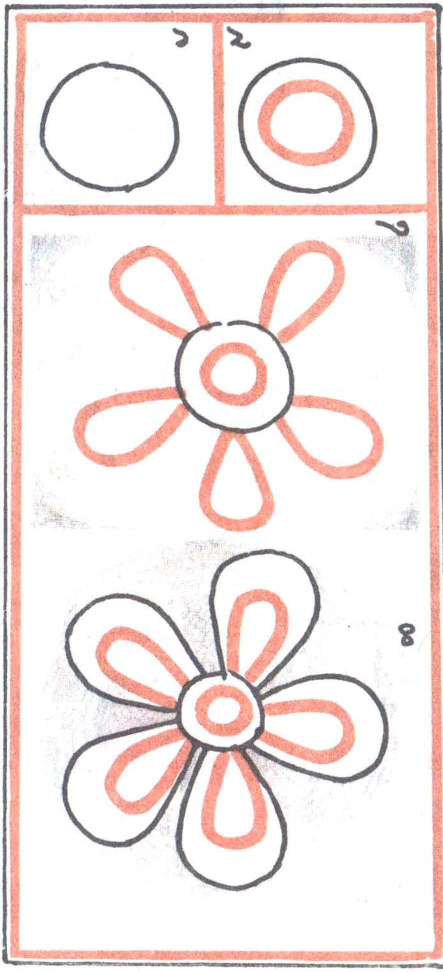

গাবলু
শহর পরিষ্কার রাখুন

জন্তু-জানোয়ার-৩

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুলের আকারের ভেতর দিয়েই তোমার আঁকা আস্তে-আস্তে কেমন জন্তুর আকার নিতে পারে, দেখাচ্ছি। সেই সঙ্গে এক আকারের সঙ্গে অন্য আকারের যোগ দেওয়াতে তা কেমন ভাবে রূপ নিচ্ছে সেদিকেও লক্ষ রাখো।

শেষ হওয়ার জন্য আগামী সংখ্যায় নজর রাখবে।



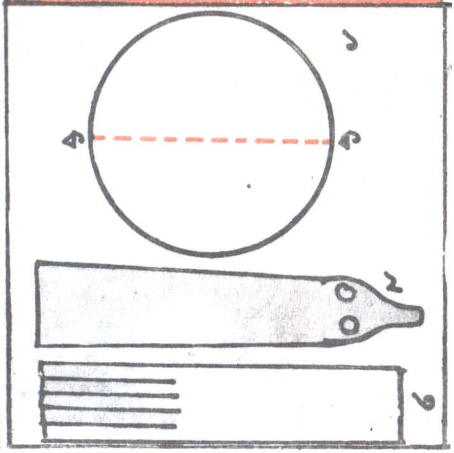
দোলনা পাখি-১

কারিগর

যা জিনিস আছে তাই দিয়েই আরম্ভ করো। যত বড় পাখি করতে চাও সেই মতো একটি ছক করে নাও। এবার ছক অনুযায়ী পাখির শরীরের অংশের জন্য গোল করে চাকতি কেটে (১ নং ছবি) তার মাঝ-বরাবর একটা দাগ (ক থেকে ক ছবি) দিয়ে রাখো। শরীর ছাড়া গলা, মুখ (২ নং ছবি) আর লেজের জন্য বোর্ড কেটে নাও। তৈরির জন্য আগামী সংখ্যায় নজর রাখবে।

জেনে রাখো: (১) শরীরের জন্য বোর্ড একটু মোটা নেবে। (২) বোর্ড কাটবার সময় সমান আর সোজা না হলে পাখি দুলবে না। গোল চাকতি বোর্ডের মাঝখানের (ক-ক) দাগটি বেশ চেপে দেবে কোনো শক্ত জিনিস দিয়ে, যাতে পরের দিকে ভাঁজ দেওয়া সহজ হয়। (৩) কেটে-রাখা লেজের টুকরো যে-কোনো দিকে খানিকটা অংশ লম্বা-লম্বা করে কেটে দাও (৩ নং ছবি), তাতে লেজের হালকা-ভাব আসবে।







"বাঁচাও
"বাঁচাও!
.... হাইজ্যাক....
....বাপরে!"
চোরেরা চোঁ-চাঁ ভাগছে
ররর-রুম......
বাম্বী'ও
তাদের পিছে ছুটছে
চোরেরা তাদের লুকানো
জায়গায় থমকে দাঁড়ালো
বাম্বীও চটপট জরুরী
খবর পাঠালো....
চোরেরা লুটের মাল চাখছে চাকুম..চাও..
বাম্বী ও তার বন্ধু তাদের
করলো ঘেরাও
"তোমরা ঘেরাও-কোরো না কো ফন্দি
৩ মিনিটের মধ্যে
তোমরা আমাদের বন্দি!"
"নিউট্রিন....
উমম্.... চমৎকার!
দেখলেই জিভে জল আসে!
নিউট্রিন
চাকুম চাকুম খাসা
মিষ্টি দিয়ে ঠাসা
nutrine



“এ বিশ্বকে— শিশুর বাসযোগ্য ক’রে যাব আমি— এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার”

কৈশোর অনুত্তীর্ণ এক কবি — যাঁর কবিতা আগামী পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার দায়িত্বে সোচ্চার হয়েছিল।

কত আশা, কত কল্পনা নিয়ে আগামী দিনের নাগরিক – শিশুরা বড় হয়, স্বপ্ন দেখে। হাজারো ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন।

আগামী দিনের পৃথিবীর অধীশ্বর আজকের শিশুদের জন্য আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে একটি প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হোক ঃ শিশুদের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করার, আগামী দিনের পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার দায়িত্ব বর্তমানের।

আর, বহুদিনের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণায় দীর্ণ এই রাজ্য। এই পশ্চিমবঙ্গ। রুদ্ধ অভিমানে যার দেহ পাষাণ, ধূলিমলিন। সেই পাষাণে, সেই ধূলোয় টলমল পায়ে যে শিশুদের বয়স বাড়ে। অন্ধকার ঘরে যারা আজও অসূর্যম্পশ্য। যাদের অকাল মৃত্যুর দায় কেউই নিতে রাজী নয়। তাদের জন্য, সকলের জন্য এই ভালবাসার রাজ্যকে বাসযোগ্য করার, এক আলোকসম্ভব ভবিষ্যতকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব আমাদের।

medium

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ্